প্রথম সংস্করণ

যশস্বী চিত্রপরিচালক

অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

শ্রীকরকমলেষু

মন্মথ রায়

১লা বৈশাখ

১৩৫৭

'কৃষাণ'এর মূল কাহিনীটি রচনা করিয়াছিলাম ১৯৪০ সালে। আমি তখন সমবায় মাসিক পত্রিকা 'ভাণ্ডার'এর সম্পাদক। এই কাহিনীর ভিত্তিতে যে নাটক রচনা করিয়াছিলাম, ১৯৪০ সালের ৩০এ মার্চ 'বেঙ্গল কোঅপারেটিভ অ্যালায়েন্স'কর্তৃক কলিকাতা টাউন হল্এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বার্ষিক 'কোঅপারেটিভ ব্রাদারহুড্' ভোজসভায় তাহা অভিনীত হয়— অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় এই নাটকখানির পরিচালনা করেন।

পরবর্তী কালে অর্ধেন্দু যখন চিত্রপরিচালনায় সাফল্য ও যশ লাভ করেন তখন এই কাহিনীটিকে স্মরণ করেন, এবং 'রঙ্গশ্রী' চিত্রপ্রতিষ্ঠান অর্ধেন্দুর হস্তেই ইহার চিত্ররূপ-দানের ভার অর্পণ করেন। এতদুপলক্ষে আমি যে চিত্রনাটিকা রচনা করিয়াছিলাম, তাহা পরম আত্মীয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হইল।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী রঙ্গশ্রী কথাচিত্রের প্রযোজিত, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালিত 'কৃষাণ'এর বাঙলা বাক্‌চিত্র কলিকাতায় প্রথম প্রদর্শিত হয়। এই চিত্ররূপ দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই, কিন্তু এ বিশ্বাস আমার আছে যে, অর্ধেন্দুর পরিচালনায় আমার কাহিনী উৎকর্ষই লাভ করিয়া থাকিবে।

এই চিত্রনাটিকার প্রণয়নে শ্রীযুক্ত মন্মথ চৌধুরী এবং ইহার সম্পাদনে শ্রীযুক্ত প্রমথ গুপ্ত আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পূজনীয় খুল্লতাত শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রায় তাঁহার মুক্তাক্ষরে এই চিত্রনাট্যের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন; ইহা তাঁহার স্নেহের পরম নিদর্শনরূপে আমার নিকট সযত্নে রক্ষিত হইবে। প্রচ্ছদচিত্রখানি প্রসিদ্ধ চিত্রী শ্রীযুক্ত বি ভৌমিক অঙ্কন করিয়া দিয়াছেন; তাঁহাকেও কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রীযুক্ত কালীপদ চট্টোপাধ্যায় ইহার গ্রন্থনে সহায়তা ও প্রশোধন করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

২২৯সি, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা ৬

মন্মথ রায়
১লা বৈশাখ ১৩৫৭

এসেছি! তোর কি? তোর সাত পুরুষ তো ঐ ভিটেতে জন্মায়নি —মরেনি! ও-জলের মর্ম্ম তুই কি বুঝবি?

ক্রোধে ও ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া ঝড়ের [illegible] গেল, [illegible] গেল পরাণ। [illegible] আসিতেছে। খাসীটির দড়ি ধরিয়া সে দ্রুতপদে ভিতরে ছুটিয়া গিয়া উচ্চ কণ্ঠে সংবাদ দিল—

লক্ষ্মণ ॥ মা মা, ঐ দেখ বুড়ো ভূতটা আবার এসেছে।

বালকের মা দুর্গা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল, পুত্রের সাড়া পাইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল—

দুর্গা ॥ ছিঃ, লক্ষ্মণ, গুরুজনকে ভূত বলতে নেই—উনি তোমার দাদু।

পথশ্রান্ত বৃদ্ধ ভিতরে প্রবেশ করিয়া কুটিরের দাওয়ায় বসিয়া পড়লে দুর্গা ব্যস্ত হইয়া একটি ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া গেল। লক্ষ্মণ খাসীটিকে দাদুর সম্মুখে হাজির করিয়া কহিল—

লক্ষ্মণ ॥ হট্—হট্—ফের পালাচ্ছিস! দেখছিস না কদ্দিন পরে দাদু এল! নম কর্—নম কর্।

পরাণ ॥ বাঃ, খাসা খাসা দেখছি।

বৃদ্ধের শুষ্ক দৃষ্টি লালসায় সজল ও তীব্র হইয়া উঠিল

লক্ষ্মণ ॥ তাইতো ওর নাম দিয়েছি 'রাজা'!

পরাণ ॥ দা'টা নিয়ে আয় তো।

লক্ষ্মণ ॥ কেন দাদু?

পরাণ ॥ ওকে কাটব—খাব—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে রে!

বালক বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল

'কৃষাণ'এর মূল কাহিনীটি রচনা করিয়াছিলাম ১৯৪০ সালে। আমি তখন সমবায় মাসিক পত্রিকা 'ভাণ্ডার'এর সম্পাদক। এই কাহিনীর ভিত্তিতে যে নাটক রচনা করিয়াছিলাম, ১৯৪০ সালের ৩০এ মার্চ 'বেঙ্গ [illegible] নকে
[illegible]পারেটিভ অ্যালায়েন্স' কর্তৃক কলিকাতা টাউন হল্‌এ অনুষ্ঠিত [illegible]
[illegible]অপারেটিভ ব্রাদারহুড্' ভোজসভায় তাহা অ[illegible] বাহিরে আসিয়া
[illegible] কহিল—

দুর্গা ॥ লক্ষ্মণ!···

লক্ষ্মণ ॥ দেখতো মা, রাজাকে কেটে খেতে চায়!

পরাণ ॥ ক্ষিদে-তেষ্টায় প্রাণ যায়—তাই ঠাট্টা করছিলাম!···যা শালা যা,—আমি না খাই, আর কেউ খাবে।

দুর্গা ভাতের থালা ও জলের গ্লাস শ্বশুরের সম্মুখে রাখিয়া দিল। পরাণ ব্যগ্রভাবে জলের গ্লাসটি হাতে লইয়া পান করিতে উদ্যত হইয়াই হঠাৎ প্রশ্ন করিল—

পরাণ ॥ এ কোন্ কুয়োর জল মা? আমার সাবেক ভিটের?

দুর্গা ॥ (ভয়ে-ভয়ে) নতুন কুয়োর জল বাবা।

পরাণ ॥ নতুন কুয়োর জল! খাব না, খেতে হয় তোরা খা। বলিনি যে, যে-ক'টা দিন বাঁচি, আমায় সাবেক কুয়োর জল দিবি?

দুর্গা ॥ মহাজন যে সাবেক কুয়ো থেকে জল আনতে দেয় না বাবা।

পরাণ ॥ মহাজন ভিটে-মাটি নিলেম করেছে ব'লে কি জলও নিলেম ক'রে নিয়েছে? আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

দুর্গা ॥ বাবা, আপনি যাবেন না। মহাজনের কাছে গিয়ে আমিই সাবেক কুয়োর জল ভিক্ষে চেয়ে আনছি।

পরাণ ॥ ভিক্ষে! ভিক্ষে কেন? মহাজন তো বলেছিল—'বুড়ো, যদ্দিন তুমি বাঁচবে, এই জলই খেয়ো'। তাই-না আমি ভিটে ছেড়ে

এসেছি! তোর কি? তোর সাত পুরুষ তো ঐ ভিটেতে জন্মায়নি —মরেনি! ও-জলের মর্ম্ম তুই কি বুঝবি?

ক্রোধে ও ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল পরাণ। দুর্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহার গমনপথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। লক্ষ্মণ বিস্মিত হইয়া কহিল—

লক্ষ্মণ ॥ রাক্ষসটা না খেয়ে চ'লে গেল কেন মা?

দুর্গা ॥ ছিঃ, বাবা, দাদুকে রাক্ষস বলতে নেই।

লক্ষ্মণ ॥ রাক্ষস নয় তো কি? আমার রাজুকে খেতে চায় কেন?

দুর্গা ॥ খুব বেশী ক্ষিদে পেয়েছিল তাই। কিন্তু সত্যি কি আর খেতেন? দেখলি তো ভাত চারটেও আর খেলেন না।

লক্ষ্মণ ॥ কিন্তু রাজুকে পেলে ঠিক খেতেন। তুমি দেখনি মা, ওর জিভ দিয়ে জল পড়ছিল—হ্যাঁ মা, তোমার আচার দেখলে যেমন আমার জিভে জল আসে।

কথাবার্ত্তায় দুর্গা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল—এই সুযোগে খাসীটি পরাণের পরিত্যক্ত ভাতের থালায় মুখ দিয়া উহার সদ্ব্যবহারে তৎপর হইল—এমন সময় হঠাৎ ঘটনাস্থলে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধের পুত্র অর্জ্জুন এই দৃশ্য দেখিতে পাইল।

অর্জ্জুন ॥ এই—এই—হট্—হট্! আ মোলো যা! দুর্গা, দুর্গা! রাজা ভাত খেয়ে গেল!

দুর্গা ॥ এই দেখ! বাবা যদি ফিরে আসেন, কি খেতে দেব? লক্ষ্মণ, কতবার বলেছি, রাজাকে বেঁধে রাখবি। কোথায় গেল? দেখ শেয়ালে আবার না ধরে।

লক্ষ্মণ ॥ ও এমন ছুটতে জানে—শেয়ালের বাবাও ওকে ছুঁতে পারবে না। দেখছি আমি।

চলিয়া গেল

অর্জ্জুন ॥ বাবা কি না খেয়ে চলে গেছেন ?

দুর্গা ॥ সেই এক গোঁ—সাবেক কুয়োর জল চাই।

অর্জ্জুন ॥ আমি তো তোমায় বলেছি, নতুন কুয়োর জল দিয়েই বোলো—সাবেক কুযোর জল।

দুর্গা ॥ মিথ্যে আমি বলতে পারব না। আর, ব'লে লাভও নেই,—জল মুখে দিলেই তিনি বুঝতে পারেন। বাবার একবার খোঁজ করবে না ?

অর্জ্জুন ॥ মর্জ্জি হ'লে তিনিই আসবেন, নইলে পায়ে ধ'রেও আমি তাঁকে আনতে পারব না। খুঁজে লাভ কি ?···চল, খেতে দেবে চল।

*   *   *   *

গভীর রাত্রি। পত্নীপুত্র সহ অর্জ্জুন সুপ্তিমগ্ন। সহসা বাহিরে একটা শব্দ শুনিযা দুর্গার ঘুম ভাঙ্গিযা গেল।

দুর্গা ॥ ওগো! ওগো! শুনছ ?

অর্জ্জুন ॥ (তন্দ্রাস্বরে) উঁ ? কি হ'ল ?

দুর্গা ॥ ঐ শোন, কে যেন গোঙাচ্ছে!

অর্জ্জুন কান পাতিয়া শুনিল

অর্জ্জুন ॥ তাইতো! কে ?

দরজা খুলিয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া অর্জ্জুন দেখিতে পাইল, প্রাঙ্গণে পড়িয়া কাতর আর্ত্তনাদ করিতেছে তাহার বৃদ্ধ পিতা! অর্জ্জুনের পিছনে দুর্গাও

আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধের আর্ত্তনাদ একই ভাবে চলিতেছিল—

পরাণ ॥ উঃ ! আ—আঃ—

অর্জ্জুন ॥ এ কি, বাবা ! কি হয়েছে ? তোমাকে মেরেছে ? কে মেরেছে ? কে মেরেছে ?

দুগা বৃদ্ধের নিকটে বসিয়া পড়িয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল

পরাণ ॥ মহাজনের লোক রে—মহাজনের লোক !

অর্জ্জুন ॥ কতবার তোমাকে বলেছি, ও আর আমাদের বাড়ী নয়—ওখানে তুমি যাবে না ; তবু কেন তুমি ওখানে মরতে যাও ?

পরাণ ॥ জল খেতে—জল খেতে। ও-কুয়োর জল ছাড়া যে আমার তেষ্টা মেটে না রে—

অর্জ্জুন ॥ এখন মিটেছে তো ! এস, ঘরে চল –

পরাণ ॥ আমি যাব না তোর ঘরে। বুড়ো বাপকে একটু জল দিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারিস না—অথচ তোদেরই জন্যে আমার সব গেছে ঐ মহাজনের হাতে। না, আমি যাব না।

অর্জ্জুন ॥ কে তোমায় বলেছিল ধার-কর্জ্জ করতে ?

পরাণ ॥ (উন্মাদের হাসি হাসিয়া) কে বলেছিল ! ··ধার করবে না !··· ধারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আমরা জন্মাই—ধার ক'রে আমরা বাঁচি—আর এই দেনার দায়েতেই আমরা মরি। খাটতেও কসুর করিনে। সকাল থেকে সন্ধ্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষবাস করি, ফসলও ফলে—সোনার ফসল ; তবু আমার বলতে আমাদের কিছুই নেই—হাড়ভাঙা খাটুনির মজুরীতে আসল শোধ হয় না। (একটু দম লইয়া) নিক্, ওরা যত পারে নিক্ ; কিন্তু ওটা আমার সাত পুরুষের ভিটে—ঐ বাড়ীতে আমি জন্মেছি, আমার বাবা চোখ বুজেছে,

মা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে, তুই ওখানে হয়েছিস। আমার সাত পুরুষের মাটি। তুই ওদের বলিস অর্জ্জুন, আর কিছু না—আমায় যেন ওরা ঐ মাটিতে মরতে দেয়।

*　　*　　*

পৌষ মাসের শেষ ভাগ। এবার ধানের ক্ষেতে সোনা ফলিয়াছে। কল্যাণপুর গ্রামের কৃষককুল সারা বছরের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের সার্থকতায় মনের আনন্দে মাতিয়াছে। ধান কাটার পালা সুরু হইয়াছে—ধানের ক্ষেতে গ্রামবাসিগণের আজ আনন্দ-মেলা। বৃদ্ধ পরাণ মণ্ডল আসিয়াছে সপরিবারে—অর্জ্জুন, দুর্গা লক্ষ্মণ, এমন কি পূর্ব্বোক্ত খাসীটিও বাদ যায় নাই। কৃষক-পরিবারের এই সময়টির মত আনন্দ ও উৎসবের দিন আর নাই;—ইহারই প্রতীক্ষায় তাহারা সারাটি বছর ধরিয়া সাগ্রহে দিন গণিতে থাকে।
দেখা যাইতেছে, বৃদ্ধ পরাণ গাছতলায় বসিয়া হুঁকা হস্তে মনের সুখে ধূমপানে রত। এদিকে খাসীটি ধান খাইতেছে।

অনেক কৃষক॥ হাড়হাবাতে বুড়ো, বলি চোখের মাথা খেয়েছ? এদিকে খাসীতে যে ধানগুলো সাবাড় করে দিলে!…এই শালা, ভাগ্!

পরাণ॥ খেতে দে, খেতে দে বাবা, খাসীতে আর কত খাবে। খাসীতে না খায়, মহাজনেই খাবে। ও একই কথা।

দুর্গা একটি একটি করিয়া মাটিতে পড়া ঝরা ধানগুলি সযত্নে আঁচলে তুলিয়া লইল এবং লক্ষ্মণ ধানের বোঝা মাথায় উঠাইয়া বাড়ীর দিকে চলিবার উপক্রম করিল।

দুর্গা ॥ লক্ষ্মণ, দেখছিস তো বাবা—ঐ তো ধান রয়ে গেছে। ধান ফেলে যেতে নেই বাবা। খুঁটে খুঁটে তুলে নে।

হঠাৎ সকলে দেখিতে পাইল, মহাজন আদালতের পিওন সহ সদলবলে তাহাদের দিকে আসিতেছে—পুরোভাগে মহাজনের গোমস্তা দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন ॥ এই, দাঁড়াও! ধান নিয়ে দিব্বি স'রে পড়ছ যে!

মহাজন ॥ তা ধানগুলো আর কষ্ট ক'রে মাথায় বইছ কেন বাবা! গাড়ী এনেছি তো! দে বাবা তুলে দে!

অর্জ্জুন ॥ বাঃ রে, গাড়ীতে তুলে দেব মানে?

দুর্য্যোধন ॥ (পিওনের প্রতি) চুপ ক'রে রইলে কেন হে? বাবাজীবনকে মানেটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাও তো!

পিওন ॥ সাতশ' পচাত্তর নম্বর টাকার মামলায় মহাজন যুধিষ্ঠির সামন্ত তোমার এই ধান অগ্রিম ক্রোক করেছে! এই ধান অগ্রিম ক্রোক হ'য়ে রইল।

পিওনের নির্দ্দেশে মহাজনের লোক ধানের বোঝা অর্জ্জুনের মাথা হইতে নামাইয়া গাড়ীতে উঠাইলে বেচারি নির্ব্বাক-ক্ষোভে তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া কেবল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে যেন একটি অস্ফুট শব্দ বাহির হইয়া আসিল 'হা ভগবান'। একান্ত অসহায়ের মত অঞ্চলের ধান কয়টি বুকে চাপিয়া ধরিয়া ভয়ে ও দুঃখে দুর্গা কাঁদিয়া ফেলিল। আর, বৃদ্ধ পরাণ আশাভঙ্গের নিদারুণ ক্ষোভের জ্বালায় বুকভাঙ্গা কান্নার নামান্তর একপ্রকার অদ্ভুত অট্টহাসির শব্দে সকলকে সচকিত

করিয়া মর্ম্মস্পর্শী ও অসংলগ্ন ভাষায় যাহা ব্যক্ত করিল তাহা একমাত্র তাহার মত হতভাগ্য কৃষকের পক্ষেই সম্ভব।

পরাণ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! বলেছিলাম না যে, আমাদের ধান হয় খাসীতে খাবে, না হয় মহাজনে খাবে! জমি যে চষবে সে খাবে না। তোল্ বাবা তোল্, গাড়ীতে ভাল ক'রে সাজিয়ে দে। বল হরি হরিবোল!

দুর্য্যোধন ॥ আ মরণ! পাগলটার কাণ্ড দেখ!

পরাণ ॥ তা আমাকে এমনি ক'রে ক্রোক করবে বাবা? আমায় তোমার গাড়ীতে তুলে, আমার—না না—তোমার ভিটেয় নিয়ে মাটি দেবে? আমি যে সেই দিনটিরই পথ চেয়ে ব'সে আছি।

হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল

অর্জ্জুন ॥ আদালতের পিওন! অগ্রিম ক্রোক!! কিন্তু—কিন্তু—সারা বছর আমরা কি খাব, মহাজন?

মহাজন ॥ সে ভাবনা ভাবিসনে অর্জ্জুন—আমি বেঁচে থাকতে তোদের দু'মুঠো ভাতের অভাব হবে না। তবে, ন্যায্য পাওনা ছেড়ে দিই কি ক'রে বল্? আদালত রয়েছে—অবিচার কিছু হবে না। আরে যাঃ, ব'সে পড়লি যে? আরে হবে, হবে। তোদের বাঁচিয়ে না রাখলে আমি বাঁচব কি ক'রে?

পরাণ ॥ তোমার-আমার ভালবাসা—
যেন হিঁদুর ঘরে পাঁঠা পোষা।

ক্ষোভের হাসি হাসিয়া উঠিল

মহাজনের লোকজন ও গাড়ী চলিতে লাগিল—একটু দূরে থাকিয়া তাহারই পিছনে পিছনে রওনা হইল পরাণ মণ্ডল সপরিবারে গ্রাম্যপথ ধরিয়া। এই পথের

মধ্যে দেখা গেল, ধান-বোঝাই একখানি চলন্ত গরুর গাড়ীর উপরে সুখাসনে বসিয়া আছে দুর্গার প্রতিবেশিনী রুক্মিণী। গাড়ীর চালক তাহার স্বামী গণেশ মণ্ডল স্বয়ং। দুর্গা নিকটে আসিলে নিজের পদমর্য্যাদা ও সৌভাগ্যে গর্ব্বিতা গণেশ-ঘরণী সখীর মনে ঈর্ষা-উদ্রেকের উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ করিয়া কহিল—

রুক্মিণী ॥ কি ভাই পটের বিবি, তোমাদের ধান বুঝি, ভাই, হাতীর পিঠে ক'রে আসছে ? তা ভাল—অনেক ধান কিনা—

দুর্গা নিরুত্তরে পথ-চলিতে লাগিল

*   *   *   *

মহাজন যুধিষ্ঠির সামন্তর গোলাবাড়ীর প্রাঙ্গণ। স্তূপীকৃত ধানের রাশিকে কেন্দ্র করিয়া ভাগচাষীরা বুভুক্ষু ভিক্ষুকের মত ভীড় জমাইয়া বসিয়া আছে—তাহাদের নিজ নিজ অংশের ধানের প্রত্যাশায়। ধূলিমলিন দপ্তরটি লইয়া মহাজনের গোমস্তা দুর্য্যোধন গভীর মনোযোগ-সহকারে ধানের সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত।

দুর্য্যোধন ॥ কুড়োয় কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে
কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্জে—

হারাধন, তোমার ভাগে এই হ'ল গিয়ে—দু'মণ দশ সের সাত ছটাক—

হারাধন ॥ কিন্তু আমি তো দশ মণ ধান তুলেছি হুজুর ? আমার ভাগে তো হিসেবমত পাঁচমণে গিয়ে দাঁড়ায়।

দুর্য্যোধন ॥ গত বছরের সুদ বন্ধ ছেড়ে দিই !—রামরাজত্ব ক'রে দিই !

কিন্তু ব্যাটা, আমি ছাড়লেও তো হিসেবে ছাড়বে না—আদালত ছাড়বে না,—বুঝলি? সেই তো আবার খাবার নেই ব'লে ধান চাইতে আসবি। তখন?

হারাধন॥ তা দাও বাপু—তোমাদের হিসেবেই যা দেবার হয় দাও। তোমাদের দেনা—ও কোনকালে শোধ হবেও না। মিছে বাজে বকি।

দুর্য্যোধন॥ বুঝেছিস? বেশ বেশ! এই চিঠ্ নে। ওখানে দেখিয়ে ধান নিয়ে যা। হ্যাঁ, এবার নকুল মণ্ডল এস।

নকুল-নামধারী ব্যক্তিটি হুজুরে হাজির হইল। তাহার জীর্ণ বেশ ও ম্যালেরিয়া-প্রভাবে শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ—সুবৃহৎ প্লীহায় পরিপূর্ণ স্ফীত উদর।

ও বাবা! এ-যে ঘাটের মড়া রে! তা তুই ধান নিয়ে কি করবি? সঙ্গে ক'রে ঘাটে নিয়ে যাবি?

নকুল॥ সেই আশীর্ব্বাদই কর বাবা—যেন শিগ্গির-শিগ্গিরই ও-পথে যাত্রা করতে পারি! অদেষ্টর কথা আর ব'লে লাভ কি?—

দুর্য্যোধন॥ থাক্ থাক্ হয়েছে।…তা দেখছি, এক বিঘে মাটি চ'ষে ধান দিয়েছিস মোটে চার মণ। তোর ভাগে হবে দু'মণ। সুদের বাবদ কাটা যাবে—

কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে
কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্জে—

তা হ'লে থাকছে গিয়ে—উঁহুঁ:, তোর ভাগে তো শূন্য ছাড়া আর কিছুই থাকছে না।

নকুল॥ কিন্তু, কি খাব বাবা? যে ক'টা দিন বাঁচি দু' মুঠো খেতে দাও বাবা।

দুর্য্যোধন ॥ দিই কি ক'রে ? এই তো সামনে আসছে বুড়োশিবের মেলা ॥ জুয়া খেলে, তাড়ি খেয়ে সবই তো উড়িয়ে দিবি। কে জানে বাবা, হয়তো তার আগেই পটল তুলবি। পাওনা আদায় করতে হ'লে আমাকেই যে তোর পিছু পিছু স্বর্গে যেতে হবে বাবা। না না, ধান-টান আর হবে না। দেনা-পাওনা সব চুকে গেল—যা বাড়ী যা।

নকুল ॥ কিন্তু হিসেবটা…

দুর্য্যোধন ॥ হিসেব আবার তুই কি বুঝবি ?

কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে
কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্জে—

কি বুঝলি ? যা যা, এখন কাজের সময় ঝামেলা করিসনে। ওহে অর্জ্জুন, এস বাবা এস। তা তোমার নিজের জোতের ধান তো অগ্রিম ক্রোক হয়েছে। আমাদের যে জোত ভাগচাষ করেছ তাতে তোমার পাও ়াড়াচ্ছে ছ'মণ। হিসেবটা বুঝিয়ে দেব কি ?

অর্জ্জুন ॥ না থাক্। আপনার হিসেব আর এ জন্মে বুঝব না। এখন কি দিচ্ছেন দিন—দিন।

দুর্য্যোধন ॥ ওই, ছ'মণ। এই নাও চিঠ্।

* * *

গ্রাম্যপথ ধরিয়া চলিয়াছে অর্জ্জুনের ধানের গাড়ী। গাড়ীর উপরে বসিয়া আছে অর্জ্জুন। নকুল গাড়ীর সঙ্গে চলিয়াছে নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে—তাহাকে অনাহারে মরিতে হইবে !

অর্জ্জুন ॥ তা, যে দু'দিন বাঁচিস, না খেয়ে মরবি কেন ?

নকুল ॥ কি ক'রব ? এক দানা ধানও যে দিলে না !

অর্জ্জুন ॥ ওরা দেয়নি, আমি দিচ্ছি—

নকুল বিস্মিত হইল। এ কি কথা কহিতেছে অর্জ্জুন ? মহাজন তাহার দুঃখ বুঝে নাই—যাহার অনেক আছে ; কিন্তু অর্জ্জুন বুঝিয়াছে—যে তাহারই মত দুঃখী। নকুলের শুষ্ক চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

নকুল ॥ তুমি দেবে ? তোমার কি ক'রে চলবে ?

অর্জ্জুন ॥ তোর যে ভাই একেবারেই চলবে না। চলবে না কারুরই ; তবু যে দুটো দিন পারি, এক সঙ্গেই চলুক।...বুড়োশিবের মেলায় যাচ্ছিস তো

নকুল ॥ আমি ! মরতে ব'সে সখ !

অর্জ্জুন ॥ আরে, আমাদের বিনে-পয়সার সখ। চোখ দিয়ে দেখা। চোখ দুটো মহাজন এখনো কেড়ে নেয়নি। যাস্, বুঝলি ?...এই যে, ধান নে।

নকুলের মাথায় ধানের বস্তা তুলিয়া দিল

* * * *

বিখ্যাত বুড়োশিবের মেলার রকমারি চমকপ্রদ দৃশ্যাবলী—যে কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সারি সারি সুসজ্জিত দোকান-পশরার তাঁবু। কোথাও বাঁদর-নাচের ধুম, কোথাও বা নাগরদোলার খেলা—আবার ওদিকে দেখা যাইতেছে গাজনের সং সাজিয়া নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছে একদল লোক—তাহাদের পিছনে কৌতূহলী বালক-বালিকার আনন্দ-উল্লাস। মহা মুস্কিলে পড়িয়া গিয়াছে আজ এই ছেলে-মেয়েরা, কারণ চক্ষু যে তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে মাত্র দুইটি

করিয়া। এই সব মনোহারী দৃশ্যাবলীর কোন্‌টিকে বাদ দিয়া কোন্‌টি দেখিবে ইহাই দাঁড়াইয়াছে তাহাদের মহাসমস্যার বিষয়। এদিকে থাকিলে ওদিকে ফুরাইয়া যায়—এমনি অবস্থা তাহাদের, অথচ মনের অভিপ্রায় সব-কিছুই দেখিবার। গ্রাম্য কৃষক-রমণীগণের মনে আজ আনন্দের বান ডাকিয়াছে—অপরূপ প্রসাধন ও বেশভূষা তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে। নিজ নিজ অলঙ্কার ও শাড়ীর বাহার দেখাইবার এমন সুবর্ণ-সুযোগ আর তাহাদের কবে মিলিবে!

দেখা গেল, মেলার মধ্য দিয়া এদিকে আসিতেছে রুক্মিণী ও দুর্গা।

রুক্মিণী ॥ কি ভাই, খালি-হাতে যে? এখনও কিনিসনি কিছুই?

দুর্গা ॥ কি আর কিনব?

রুক্মিণী ॥ আমিও ভাই তাই বলছিলাম। তোমার দেওর তো কিছুতেই শুনবে না! কি কিনছে আর কি না কিনছে—বাসন থেকে সুরু ক'রে মায় চুড়ি আংটি মাথার কিলিপ্। নালাম্বরীতে আমায় ভালো দেখায় ব'লে মিন্‌সে এখন সারা মেলায় নীলাম্বরী খুঁজে বেড়াচ্ছে। পারিনে ভাই, আর সামলাতে পারিনে—

দুর্গা ॥ হ্যাঁ, সে তো জানি—গণেশ-ঠাকুরপো যে রুক্মিণী বলতে অজ্ঞান!

রুক্মিণী ॥ হ্যাঁ, তুমি যেমন তোমার সোয়ামী বলতে অজ্ঞান। আমি তো তাই বলি, রূপ ধুয়ে যদ্দিন পারিস জল খেয়ে নে!…যাই ভাই, দেখি আবার মেলাশুদ্ধ না কিনে বসে।

উভয়ে অন্যদিকে প্রস্থান করিল

*   *

নাগরদোলাওয়ালা উচ্চ চীৎকার করিয়া লোকের ভীড় জমাইতেছে আর ঘণ্টা বাজাইতেছে। ওদিক হইতে ছুটিয়া আসিল লক্ষ্মণ—তাহার আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা নাই। তাহাকে নাগরদোলায় চড়িতেই হইবে—এ সুযোগ হারাইবার পাত্র সে নয়--কখনই নয়।

নাগরদোলাওয়ালা ॥ (ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে) চ'ড়ে যাও—চ'ড়ে যাও—বন্ বন্ বন্ ঘুরে যাও—

লক্ষ্মণ ॥ ক' পয়সা ?

নাগরদোলাওয়ালা ॥ (লক্ষ্মণের দিকে তাকাইয়া) ক' পয়সা—চার পয়সা।

লক্ষ্মণ পয়সা তাহার হাতে দিয়া দোলায় গিয়া বসিল—উহা একটু নড়িয়া উঠিতেই বালক ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দোলাটি দুই হাতে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। দোলা একপাক ঘুরিতেই তাহার সাহস বাড়িয়া গেল—তখন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সে হাসিতে লাগিল। ঘণ্টা-সহকারে নাগরদোলাওয়ালার পেটেণ্ট চীৎকার সমভাবে চলিতে লাগিল—"চ'ড়ে যাও—চ'ড়ে যাও—বন্ বন্ বন্ ঘুরে যাও—চার পয়সায় পক্ষীরাজ চড়ো"—ইত্যাদি

*

ওদিকে দেখা গেল, অর্জ্জুন ও দুর্গা এক খড়মের দোকানের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছে—দুর্গা ঐ সুদৃশ্য খড়মের রাশি দেখিয়া থামিল ও নিকটে গিয়া একজোড়া হাতে লইয়া দেখিতে লাগিল।

অর্জ্জুন ॥ এ কি, খড়ম দেখছ যে ?

দুর্গা ॥ হ্যাঁ, এমনি একজোড়া খড়মের আমার অনেক দিনের সখ।

অর্জ্জুন ॥ খড়ম পরবে তুমি? ও বাবা, কোন্ দিন হয় তো শুনব মেয়েমানুষরাও গোঁফ-দাড়ি রাখছে!

দুর্গা ॥ পায়ে দাও তে

অর্জ্জুন ॥ তার মানে ?—আমি—

দুর্গা ॥ পরোই না।

অর্জ্জুন খড়ম পায়ে দিল—দুর্গা বসিয়া পড়িয়া পায়ে ঠিক হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতে লাগিল।

দোকানী ॥ ঠিক হয়েছে—চমৎকার মানিয়েছে, মণ্ডলের পো।

দুর্গা ॥ কত দাম ?

দোকানী ॥ তা সস্তা ক'রেই দিচ্ছি। খড়ম এর চেয়ে সস্তায় আর এ মেলায় পাবে না। দেড়—

অর্জ্জুন ॥ দেড়! আনা না টাকা ?

দুর্গা উঠিয়া দাঁড়াইল

দোকানী ॥ দেড় আনায় কাঠের খড়ম হয় না, একজোড়া খড়ের খড়ম হতে পারে।

অর্জ্জুন ॥ বটে ? তা হ'লে থাক্ তোমার খড়ম। বুঝলে দুর্গা, আমি বরং জুতোই একজোড়া কিনব! চল।

নিরাশ হইয়া উভয়ে অন্যদিকে প্রস্থান করিল

দোকানী ॥ ইস্! খড়ম কেনবার মুরোদ নেই—কিনবেন জুতো!

এক শাঁখার দোকানের সম্মুখে আসিয়া থামিল অর্জ্জুন ও দুর্গা।

অর্জ্জুন ॥ দেখি দেখি, শাঁখা দেখি।

দুর্গা ॥ না, আগে তোমার জুতো কেনো, তারপর শাঁখা কিনব।

অর্জ্জুন ॥ আগে শাঁখা কেনো, তারপর জুতো কিনব।...এ জোড়া—

দুর্গা ॥ না না, এ জোড়া নয়, এ তো খুব ভাল—অনেক দাম হবে—

অর্জ্জুন ॥ আরে, একজোড়া শাঁখা—তার আবার কত দাম! রুক্মিণী পরতে পারে আর তুমি পরতে পারবে না? নাও—পরো।

দুর্গা ॥ না, আগে দামটা জিজ্ঞেস করো।

অর্জ্জুন ॥ ও মশাই, এ জোড়ার দাম?

দোকানী ॥ ও সাচ্চা কাজ—আসল ঢাকাই—দাম সাড়ে তিন টাকা।

অর্জ্জুন ॥ তা হোক—আমার বেশ পছন্দ হয়েছে—তোমাকে পরতেই হবে দুর্গা।

দুর্গার হাতে শাঁখা দিল

(দোকানীকে দাম দিতে দিতে) রাম, দুই, তিন—এই নিন সাড়ে তিন টাকা।

দুর্গা ॥ না না, দাঁড়াও, এ আমার হাতে হচ্ছে না।

দোকানী ॥ হচ্ছে না? এই তো চমৎকার ফিট্ করেছে।

দুর্গা ॥ নাঃ, আমার হাতে লাগছে।

অর্জ্জুন ॥ কোথায় আবার লাগছে?

হাত দুখানি ধরিয়া দেখিতে লাগিল

দুর্গা ॥ আমি বলছি লাগছে। আমায় বরং ঐ জোড়া দিন।

অর্জ্জুন ॥ ও তো বাজে জিনিষ—ও আমার পছন্দ হয় না। তা হ'লে চল—অন্য দোকানেই চল।

দাম ফেরত লইয়া তাহারা প্রস্থান করিল

দোকানী ॥ (সহকারীর প্রতি) হুঁ ! লাগছে কোথায়, বুঝলে হে ?

সহকারী ॥ তা আর বুঝিনি ? হাতে নয়, লাগছে মোড়লগিন্নীর ট্যাঁকে !

অর্জ্জুন ও দুর্গা এক বাঁশীর দোকানের সম্মুখে আসিতে,
অর্জ্জুন দুর্গাকে কহিল—

অর্জ্জুন ॥ এইখানে তুমি একটু দাঁড়াও তো দুর্গা, আমি লক্ষ্মণকে ডেকে নিয়ে আসি।

দুর্গা ॥ বাঃ, আমি একা একা দাঁড়িয়ে থাকব ?

অর্জ্জুন ॥ একা আবার কেন, ঐ তো রুক্মিণী এদিকে আসছে। দাঁড়াও, এক্ষুনি আসছি।

অন্যদিকে প্রস্থান করিল

রুক্মিণী ॥ (নিকটে আসিয়া) কি ভাই, শাঁখা কিনলে বুঝি ?

দুর্গা ॥ না ভাই, পছন্দ হ'ল না।

রুক্মিণী ॥ (নিজের হাত দেখাইয়া) আমার এই শাঁখাও পছন্দ হ'ল না ?

দুর্গা ॥ তা হয়তো হ'ত, কিন্তু হাতে লাগল না।...ওমা ঐ তো লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—

লক্ষ্মণ ॥ আমি বাঁশী নেব মা। মা গো—

দুর্গা ॥ নিবি বৈকি বাবা। (দোকানীর প্রতি) কত দাম ?

বাঁশীওয়ালা ॥ চার পয়সা। এইখানে এসো-না।

লক্ষ্মণ দুর্গাকে টানিয়া লইয়া চলিল

রুক্মিণী ॥ (হাসিয়া) ইস্, লক্ষ্মণের আর তর সইছে না !

লক্ষ্মণ ॥ (দোকানীর প্রতি) একটা বাঁশী দাও তো ভাল দেখে।

বাঁশী হাতে পাইয়া বাজাইতে সুরু করিল

*　　　*　　　*　　　*

ওদিকে পূর্ব্বোক্ত শাঁখার দোকানে আসিয়া হাজির হইল অর্জ্জুন। লক্ষ্মণকে খুঁজিতে যাওয়ার অর্থই হইল—দুর্গার অজ্ঞাতসারে পুনরায় এইখানে আসা ও তাহার জন্য সেই শাঁখাজোড়াটি খরিদ করা। দুর্গার জ্ঞাতসারে তো উহা কিনিবার উপায় নাই। উঃ কী ভীষণ কৃপণ দুর্গা !

অর্জ্জুন। (দোকানীকে) না মশাই, পাওয়া গেল না। ঐ জোড়াই নিতে হবে। এই নিন—সাড়ে তিন টাকা।

*　　　*　　　*　　　*

ঠিক এমনি সময় এদিকে আর একটি বিপরীত ব্যাপার ঘটিতে দেখা গেল। দুর্গা লক্ষ্মণের সহিত পুনরায় আসিয়াছে ঐ সেই খড়মের দোকানে—উহা অর্জ্জুনের অজ্ঞাতসারে কিনিবার উদ্দেশ্যে। অর্জ্জুনের জ্ঞাতসারে তো উহা কিনিবার নাম করিতে পারিবে না ! বাবাঃ, কী যে শক্ত ঐ লোকটি, দুর্গা তাহা ভাবিতেও পারে না !

*　　　*　　　*　　　*

কৃষক-দম্পতির এই লুকোচুরির পালা শেষ হওয়ার পর অর্জ্জুন এইমাত্র দুর্গার নাগাল পাইয়াছে একটা খেলনার দোকানের সম্মুখে। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা উভয়েই গোপন রাখিয়াছে আর দুইজনের মাথায় একই রকম কল্পনা যে, সময় হইলে একে অপরকে একেবারে অবাক করিয়া দিবে। সে যাহা হউক, ঐ খেলনা দেখিয়া লক্ষ্মণের মনের অবস্থা এখন বর্ণনাতীত।

গাঁয়ের দীনু কুমোরের হাতের তৈরী মাটির হাঁস, মাটির সাহেব ও বুড়োবুড়ি—অনেক রকম খেলনাই সে দেখিয়াছে; কিন্তু কলের মেমসাহেবের পেট টিপিলে বিড়ালছানার মত মিউ মিউ শব্দ করে, চোখ পিট্ পিট্ করে—এমন অসম্ভব কথা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছে? তাহাকে উহার একটা কিনিয়া দিতেই হইবে—মা'র অঞ্চল ধরিয়া সে একেবারে দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে শান্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন॥ দেখ্—ঐ বাঘ, ঐ হরিণ, ঐ মোটর, ঐ রাধাকৃষ্ণ, ঐ বন্দুক—তোর যা খুসি কেন্। ওসব দামী কলের খেলনা আমাদের জন্যে নয় বাবা—শুধু চোখ ভ'রে দেখে নে।

লক্ষ্মণ॥ ছাই! এ মাটির! চাই না আমি! মা গো—

দুর্গা॥ মাটি হচ্ছে লক্ষ্মী, বুঝলি লক্ষ্মণ? দেখিসনি, মাটিতে কি সোনার ফসল ফলে?

লক্ষ্মণ॥ না, আমি দেখব না, নেব না—কিচ্ছু করব না—

অর্জ্জুন॥ নিবিনে তো নিসনি। কথায় বলে—গরীবের ছেলের আবার ঘোড়ারোগ—তোর হয়েছে তাই।

দুর্গা॥ নেবে, লক্ষ্মণ নেবে। নাও বাবা, তোমার যেটা পছন্দ হয় নাও। ঐ যে দেখ্—ওদিকে আবার মেঠায়ের দোকানে ওরা কত কি খাচ্ছে!

সত্যই তো!—এই সব তাজ্জব ব্যাপার দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল, তাই এ দোকানের কাজ দ্রুত শেষ করিয়া এবার একাই ওদিকে ছুট দিল। অর্জ্জুন ব্যস্ত হইয়া তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। কিছুক্ষণ পরে দুর্গা অনুপথ ধরিল।

*　　　*　　　*　　　*

তাড়ির দোকানে বসিয়া পরাণ মণ্ডল ও তৎভ্রাতুষ্পুত্র গণেশ দস্তুরমত আসর জমাইয়া তুলিয়াছে।

গণেশ ॥ রসটা কিন্তু জবর কড়া, কি বল খুড়ো ?

বেশ একটু গোলাপী নেশায় খুড়োর চক্ষু মুদ্রিত—মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে, এ বিষয়ে তাহার মতভেদ নাই।

পরাণ ॥ (চোখ খুলিয়া) হ্যাঁ বাবা গণেশ, দাও তো বাবা আর একটু—এই তোমার গিয়ে, লক্ষ্মী ছেলের মত।

গণেশ ॥ (ভাঁড় তুলিয়া) কিন্তু ফুরিয়ে গেছে।

ভাঁড় সজোরে নিক্ষেপ করিল

পরাণ ॥ আ-হা-হা—

গণেশ ॥ আ-হা-হা কেন ? আবার খাব, তোমাকেও খাওয়াব। এই—এই বাবা দোকানদার, লে-আও আর-এক ভাঁড়—কুচ্ পরোয়া নেই ; তোমাকে খাওয়াব না তো খাওয়াব কি ঐ দুর্যোধন ব্যাটাকে ? আলবাৎ খাওয়াব - তুমি হচ্ছ আমার বাবার—

পরাণ ॥ ভাই। হেঁ-হেঁ-হেঁ !···হ্যাঁ দাও, খাব—একশ'বার খাব।

গণেশ ॥ এই নাও, খেয়ে চল তাড়াতাড়ি এখন।

পরাণ ॥ কেন, আবার কোথায় যেতে হবে ? এই তো খাসা আছি বাবা !

গণেশ ॥ বাঃ খুড়ো, মনে নেই বুঝি—সেই গাজনের গান—

পরাণ ॥ ঠিক, ঠিক, কিন্ জলদি নাও ভাঁড়। আমি শিব সাজব—আমি শিব সাজব—

গণেশ ॥ আর আমি সাজব পার্ব্বতী—এই যেমন তবলার পাশে বেঁয়ে! হেঁ-হেঁ-হেঁ—

*　　　*　　　*　　　*

ওদিকে দুর্গা দাঁড়াইয়া আছে এক সূতার দোকানের সম্মুখে। নানা রংবেরংএর সূতার কেনা-বেচা চলিতেছে। সে নিজেই কিছু সূতা কাটিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, ঐ সূতার গোছাটি বিক্রী করে দোকানীর কাছে।

দুর্গা ॥ (দোকানীকে) আমার এই সুতোটা বেচব। এটাও একটু ওজন কর তো।

*　　　*　　　*　　　*

এদিকে অর্জ্জুন ও লক্ষ্মণ সারা মেলায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে দুর্গাকে

অর্জ্জুন ॥ তোর মা কি তবে বাড়ী চ'লে গেল লক্ষ্মণ? কোথাও যে তার পাত্তা নেই—

লক্ষ্মণ ॥ ঐ দেখ বাবা, ওখানে কি হচ্ছে!

তাহারা একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল, বড় রকমের একটা জমকালো তাঁবুর সম্মুখে বিষম ভীড়। সেই গাদাগাদি ভীড় হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছে দুর্গা। অর্জ্জুন নিকটে আসিয়া কহিল—

অর্জ্জুন ॥ এই যে তুমি এখানে! তোমাকে গরু-খোঁজা খুঁজেছি।

দুর্গা ॥ চুপ, ঐ দেখ—কি?

দেখা গেল, একজোড়া অপূর্ব্ব হরপার্ব্বতী উদ্দাম নৃত্য সুরু করিয়াছে এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অগণিত দর্শকের ভীড় জমিয়াছে পূর্ব্বোক্ত তাঁবুর সম্মুখে। তাঁবুর ভিতরে চলিতেছে বাঈজীর নাচগানের মহোৎসব। দুর্গা অর্জ্জুনকে কহিল—

দুর্গা ॥ যাও না, ভেতরে গিয়ে দেখেই এস না একবার।

অর্জ্জুন ॥ দেখছ না ভেতরে পয়সা নিচ্ছে! এক টাকা ক'রে টিকিট—তা আমাদের একদিনের খোরাকী। চল, আমাদের ও দেখে আর কাজ নেই।

লক্ষ্মণ ॥ না বাবা, আমি যাব না।

অর্জ্জুন ॥ তবে থাক্, আমরা কিন্তু চললাম।

এমন সময় তাঁবুর ভিতর হইতে বাহির হইল রুক্মিণী

রুক্মিণী ॥ এই যে ভাই দুগ্‌গা,—দেখে এলাম। টাকাটাই জলে গেল। নাচ তো নয়—ঢলাঢলি। মিন্‌সেগুলো হাঁ ক'রে গিলছে। তা সে-মিন্‌সে গেল কোথায়?

লক্ষ্মণ ॥ বাবা, ঐ দেখ—সং দেখ।

রুক্মিণী ॥ ওমা, এ আবার কি? বুড়োশিব দেখছি একটি জুটিয়েছেন! বা—বাঃ, বেশ দুগ্‌গো সেজেছে তো!

বুড়োশিব ও দুর্গার উদ্দাম নৃত্য

রুক্মিণী ॥ ও মা! ঢং দেখে বাঁচিনে! ওমা এটা কে গো!

দুর্গাবেশী গণেশকে চিনিতে পারিল

-তবে রে মিন্‌সে!

তাহার শাড়ী ধরিয়া টানিতে লাগিল। শাড়ী খুলিয়া আসিল। ভাগ্যে গণেশের কাপড় পরা ছিল—তাই সর্ব্বরক্ষা।

*　　　　*　　　　*　　　　*

চায়ের দোকানে বসিয়া দর্শক ও ভক্তবৃন্দ বাঈজীর রূপগুণের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের বেশভূষা তাহাদিগকে তথাকথিত ভদ্রলোক বলিয়াই প্রমাণ করিতেছে।

জীবনবাবু॥ আঃ মাইরি, কি গানই গাইলে! প্রাণটাকে তন্ময় ক'রে দিলে।

সহদেব॥ রতনবাঈএর চেয়ে বড় বাঈজী আজকাল কলকাতাতেও নেই।

জীবনবাবু॥ না, তা বলতে পার না। এর চেয়ে বড় গাইয়ে ঢের ঢের আছে। তবে হ্যাঁ, এমন চেহারা নেই।

অদূরে দাঁড়াইয়া অর্জ্জুন ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল

অর্জ্জুন॥ বাঈজী তো শুনছি ভাল। গান জম্‌ছে কেমন? সঙ্গত কি রকম?

অসিত॥ আরে রাখো তোমার সঙ্গত,—মুখখানা দেখলেই পয়সা উশুল।

*　　　　*　　　　*　　　　*

রাত্রি প্রথম প্রহর। এইমাত্র সকলে মেলা হইতে ফিরিয়াছে। অর্জ্জুন দাওয়ায় বসিয়া দুর্গার সহিত বিশ্রম্ভালাপে রত।

দুর্গা॥ মণ্ডলমশাই, এবার পায়ে দিন তো!

অর্জ্জুন॥ এ কি! সেই খড়ম? তুমি কিনেছ? ও বুঝেছি—সুতো বিক্রী করে। কেন কিনলে?

খড়ম পায়ে দিল

দুর্গা॥ বাঃ, বেশ হয়েছে, দিব্বি মানিয়েছে! সুতো-কাটা আমার সার্থক হ'ল।

চাদরের খুঁট হইতে একজোড়া শাঁখা বাহির করিল অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। দেখি দুর্গা তোমার হাতখানা।

দুর্গার হাত ধরিয়া

মণ্ডলগিন্নী, এবার হাতে পরুন তো!

দুর্গা॥ একি! সেই শাঁখা! তুমি কিনেছ? কিন্তু এত দাম দিয়ে কেন কিনলে?

অর্জ্জুন এমনি—

দুর্গা॥ তা জিনিষটা কিন্তু ভারী সুন্দর। দেখে আমার সত্যি সখ হয়েছিল।

পরম পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে দুর্গার মুখের দিকে তাকাইল অর্জ্জুন

*　　*　　*　　*

পরদিন সকালে অর্জ্জুন মাঠের দিকে চলিয়াছে চাষের কাজে। দেখা গেল, বৃদ্ধ পরাণ এইমাত্র মেলা হইতে ফিরিতেছে—কাল সারাদিন ও সারারাত্রির পর। তাহার রুগ্ন চেহারা ও সর্ব্বাঙ্গে চূণকালি মাখা।

অর্জ্জুন এই বুঝি মেলা থেকে ফিরছ?

পরাণ॥ হ্যাঁ, সারারাত শিবের নৃত্য নেচেছি—আর প্রণামী পেয়েছি। একদিনের রোজগার কত শুনবি?—বাইশ টাকা। কি দেশ রে বাবা! চাষবাস কর, জমিদার-মহাজন লুটে খাবে। শিব সেজে ব্যোম-ভোলানাথ হয়ে গাঁজায় মারো দম, সেই ব্যাটারাই এসে ভক্তি-ভরে পায়ের ধুলো নেবে—কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা দেবে আর বলবে—'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর কর বাবা'। নে বাবা, এই বাইশ টাকা নে,

আমি আবার মেলায় চললাম। নেচেকুঁদে ব্যোম-ভোলানাথ হয়ে বসে আছি।

চলিয়া গেল

এমন সময় জমিদারের পাইক আসিয়া হাজির। এই টাকা লেনদেনের কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই।

পাইক॥ কি হে মণ্ডলের পো, জমিদারের পাইককে দেখে সবাই তটস্থ হয়ে ওঠে; অথচ তোমার দেখছি হুঁসই নেই—খাজনা দেবার নামটিও নেই—অথচ মাঝপথে দাড়িয়ে খুব টাকা গুণছ! ব্যাপার কি? টাকার গরম, না?

অর্জ্জুন॥ না না, সে কি?

টাকা লুকাইতে ব্যস্ত হইল

এই—এই—গরু চরাতে যাচ্ছি খুড়ো—

পাইক॥ আর আমি যে ইদিকে তোমায় গরু-খোঁজা খুঁজছি। তিন কিস্তির খাজনা বাকি—জমিদারকে তো দিব্যি ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। বাড়ীতে টাকা না রেখে—দেখছি ট্যাঁকে টাকা গুঁজে রাখা হচ্ছে। চল—জমিদারের কাছারীতে চল; আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই বাবা—

অর্জ্জুন॥ আমি—আমি কথা দিচ্ছি খুড়ো—বিকেলে নিশ্চয়ই যাব।

পাইক॥ আরে, ওরা কা'রা পালাচ্ছে হে! আরে ঐ তো জগন্নাথ! ঐ তো রামধন! ওহে হারাধন, আমার চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় পালাবে বাছাধনরা? তা হ'লে তুমি বিকেলে যেয়ো। ওদের আমি ছাড়ছিনে।

*   *   *   *

সুকৌশলে জমিদারের পাইকের হাত এড়াইয়া মাঠে কৃষকগণ কর্ম্মব্যস্ত। কেহ জমিতে সার দিতেছে, কেহবা মুগুর দিয়া জমির ঢিল ভাঙ্গিতেছে। তাহাদের হাতের কাজেরও যেমন অন্ত নাই, মুখেও তেমনি মুখরোচক গল্পের ফোয়ারা ছুটিয়াছে।

১ম চাষী ॥ আরে, আমাদের নরনে কাল মেলার জুয়োয় দুশো টাকা জিতেছে।

২য় চাষী ॥ বলিস কি! নরনের কপাল তা হ'লে ফিরে গেল বল্। তাই আজ মাঠে আসেনি দেখছি।

১ম চাষী ॥ আর মাঠে এসেছে! দুশো টাকা পেয়ে ওর খাঁই আরো বেড়ে গেছে। আজ নাকি আবার খেলবে।

৩য় চাষী ॥ নরনের বৌ আমার বৌকে বলেছে—নরনে নাকি কাল সারারাত মাল টেনে মেলাতেই পড়েছিল।

৪র্থ চাষী ॥ মেলা থেকে বাড়ী ফিরবার সময় নরনের সঙ্গে দেখা—বললে, 'আজ ভাই সারারাত বাঈজীর নাচ দেখব'।

৫ম চাষী ॥ কি হে মণ্ডলের পো, আজ এত চুপচাপ যে? বাঈজীর নাচ কাল দেখনি তুমি?

অর্জ্জুন ॥ না, নাচ দেখবার পয়সা কোথায়?

১ম চাষী ॥ তা ভাই বলেছ ঠিক। নরনের মত কপাল হ'লে নাচ দেখা যায়। শুনছি ডানাকাটা পরী।

অর্জ্জুন ॥ সঙ্গত কেমন দেখলে হে—তবলা?

২য় চাষী ॥ তা ভাই যাই বলো, কলকাতার তবলচি—তাদের কায়দাই আলাদা। তুমি অবিশ্যি বাজাও ভাল, কিন্তু ওদের ঢংঢাংই আলাদা। আরে আজকে একবার গিয়েই দেখ না। ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না।

অৰ্জ্জুন ॥ আর দেখব! জমিদারের পাইক তলব দিয়ে গেছে—তিন কিস্তির খাজনা বাকি।

৩য় চাষী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখলাম। আমরা তো ভাই দেখেই হাওয়া হলাম।

অৰ্জ্জুন ॥ তোমরা তো হাওয়া হ'লে, এদিকে বাড়ীতে গিয়ে হয়তো ফ্যাসাদ বাধিয়েছে। বুঝলে ভাই—চাষবাস ক'রে চাষীর আর চলবে না। কপাল যদি ফেরে তবে জুয়ো খেলেই ফিরবে।

* * *

দিবা তৃতীয় প্রহর। জুয়ার আড্ডা হইতে এইমাত্র ভগ্নমনে অৰ্জ্জুন বাড়ী ফিরিয়াছে—তাহার হাতের সম্বল সব-কিছু হারাইয়া।

দুর্গা ॥ নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, সারাদিন কোথায় ছিলে? এদিকে পাইক এসেছিল। আজই নাকি তোমার তিন কিস্তির খাজনা দেবার কথা ছিল!

অৰ্জ্জুন ॥ কথা তো ছিল; কিন্তু দেবো কোত্থেকে! আর এসব কৈফিয়তই এখন কি তোমাকে দিতে হবে নাকি? খেতে টেতে দেবে কিছু? ক্ষিদে পেয়েছে।

দুর্গা ॥ এই দেখ, সারাদিন না দেখে তোমার ভাত যে নকুলকে এই একটু আগেই দিয়ে দিলাম।

অৰ্জ্জুন ॥ আমার ভাত নকুলকে দিলে? খুব বড়লোক হয়েছ দেখছি?

দুর্গা ॥ বেচারি দুদিন কিছু খায় নি—তোমার নাম করতে করতে দাওয়ায় এসে শুয়ে পড়ল। তুমি হাতমুখ ধোও—আমি এক্ষুনি ভাতে-ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি।

অৰ্জ্জুন ॥ থাক্—চিড়ে-মুড়ি কিছু থাকে তো দাও। ও কি, দাঁড়িয়ে

রইলে যে? তাও নেই? বাঃ বেশ! কেন কি হ'ল—তাও কি নকুলকে খাইয়েছ?

দুর্গা ॥ যা ছিল লক্ষ্মণ রাজাকে খাইয়েছে। আমি ভাতে-ভাত চাপাচ্ছি।

অর্জ্জুন ॥ না। লক্ষ্মণ কোথায়?

দুর্গা ॥ জমিদারের পাইক এসেছিল—লক্ষ্মণকে তোমার খোঁজে পাঠিয়েছি।

অর্জ্জুন। রাজাকে খাইয়েছ!—রাজা! আচ্ছা!

রজ্জুবদ্ধ খাসীটির দড়ি টানিয়া লইয়া হঠাৎ ঝড়ের মত বাহির হই গেল অর্জ্জুন।

দুর্গা ॥ (বিস্মিত হইয়া) এ কি! রাজাকে নিয়ে আবার যাচ্ছ কোথায়?

অর্জ্জুন ॥ চুলোয়।

এমন সময় লক্ষ্মণ ছুটিয়া আসিয়া কহিল—

লক্ষ্মণ ॥ এ কি, রাজাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বাবা?

অর্জ্জুন ॥ সব খোঁজে তোর দরকার কি?

লক্ষ্মণ ॥ কিন্তু বাবা, তোমার খোঁজে জমিদারের পাইক আসছে যে।

অর্জ্জুন ॥ তাকে বসতে বলবি। আমি আসছি।

লক্ষ্মণ ॥ তুমি আমার রাজাকে কোথায় নিচ্ছ বাবা?

অর্জ্জুন ॥ মেরে খুন করব—শীগ্‌গির বাড়ী যা।

লক্ষ্মণ ॥ মা, মা!

*　　*　　*　　*

এক কসাইএর দোকানের সম্মুখে অর্জ্জুন। রাজাকে সে বিক্রয় করিয়াছে দরদস্তুর ঠিক করিয়া। কসাই তাহার হাতে টাকা দিল—গণিয়া লইয়া অর্জ্জুন বাড়ীর দিকে চলিল। দুই পা অগ্রসর হয় আর পিছন ফিরিয়া

রাজাকে দেখে। তাহার মনে হইল, রাগের মাথায় এ কি করিল সে? ও বেচারির কি দোষ? কেন তাহার এই দুর্ম্মতি হইল? হঠাৎ সে আবার ছুটিয়া গেল খাসীটির কাছে, আদর করিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইতে লাগিল। কসাই তাহার এই ভাববৈচিত্র্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল—

কসাই ॥ কি হ'ল কর্ত্তা?

অর্জ্জুন ॥ মাপ কর ভাই, তোমার টাকা ফেরত নাও—খাসা আমি বেচব না।

*　　*　　*　　*

ওদিকে বাড়ীতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে লক্ষণ তাহার রাজার জন্য।

লক্ষণ ॥ কই মা, বাবা তো রাজাকে নিয়ে এখনো ফিরল না!

দুর্গা ॥ ফিরবে বাবা।

পরাণ ॥ ব্যাটার এদ্দিনে সুবুদ্ধি হয়েছে। তোর রাজাকে কাটতে গেছে। আঃ, আজ পেট ভ'রে মাংস আর ভাত খাব। কতদিন মাংস খাইনি!

লক্ষণ ॥ মা, রাজাকে কাটলে আমি ম'রে যাব মা।

দুর্গা ॥ ষাট্—ষাট্! ও কথা বলতে নেই। রাজাকে কাটবেন কেন তিনি? দেখিসনি—তোর বাবা কতদিন নিজের ভাত রাজার মুখে তুলে ধরেছেন।

এমন সময় বাহিরে খাসীর গলার স্বর শোনা গেল। পরক্ষণে তাহার দড়ি ধরিয়া অর্জ্জুন ভিতরে প্রবেশ করিল।

লক্ষ্মণ ॥ রাজা, আমার রাজা।

আনন্দে অধীর হইয়া জড়াইয়া ধরিল

পরাণ ॥ আজ যদিও বাঁচল, কিন্তু কাল? —তারপর? কদিন বাঁচবে? রাজা যাবে, রাণী যাবে—হাতী-ঘোড়া সব রাক্ষসে খাবে! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বৃদ্ধের ক্ষোভের আর সীমা রহিল না

দুর্গা ॥ (অর্জ্জুনকে) তুমি খাবে এস। হয়তো এক্ষুনি আবার জমিদারের পাইক এসে পড়বে।

লক্ষ্মণ ॥ না মা, পাইক চ'লে গেছে। কাল খুব ভোরে আসবে ব'লে গেছে।

* * * *

মনের উদ্বেগে কাল অর্জ্জুন সারারাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই, তাই আর বৃথা শয্যায় পড়িয়া না থাকিয়া আজ খুব ভোরেই উঠিয়া পড়িয়া বাড়ীর সম্মুখে পায়চারি করিতে সুরু করিয়াছে। নিদারুণ দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তায় মন তাহার একান্ত চঞ্চল—এখনি জমিদারের পাইক আসিয়া তাহার লাঞ্ছনার একশেষ করিবে। তাহার হঠাৎ কি মনে হইল, ঘরে ছুটিয়া গিয়া তাহার তবলাজোড়া বাহির করিয়া আনিয়া দ্রুতপদে মেলার দিকে রওনা হইল। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল, তিন কিস্তির খাজনা বাকি।

* * * *

দেখা গেল, তাঁবুর সম্মুখে বসিয়া অর্জ্জুন একমনে তবলা বাজাইতেছে—সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সহচরী তারা

ও যমুনা সহ তাঁবুর ভিতর হইতে বাহির হইল রতন-বাঈ। কোন ভূমিকা না করিয়া অর্জ্জুন জানাইল যে, তবলাজোড়া সে বিক্রী করিতে চায় তাহার নিকটে।

রতন ॥ আমাকে কিনতেইহবে? কিন্তু আমার যে অনেক তবলা রয়েছে?

অর্জ্জুন ॥ আমার খুব দরকার। আর এ তবলাজোড়া খুব ভাল—আমি জোরগলায় বলছি।

যমুনা ॥ নাও দিদি—অত ক'রে বলছে!

রতন ॥ (মৃদু হাসিয়া) নিজের জিনিষ সবাই তো ভাল বলে।

অর্জ্জুন ॥ না না, তা নয়, সত্যি ভাল তবলাটা—ভারী মিষ্টি আওয়াজ।

রতন ॥ বটে! তা হ'লে বাজাও তো শুনি।

অর্জ্জুন বাজাইতে সুরু করিল। বাঈজী পাকা লোক, বাজনা শুনিয়া কিছুক্ষণেই সে বুঝিল, এ বিদ্যায় সে সত্যই পারদর্শী। তাই এই নবাগত দরিদ্র শিল্পীর প্রতি তাহার মনটা দরদে ভরিয়া উঠিল।

রতন ॥ সত্যি খুব ভাল তবলা। আরো ভাল তোমার হাত। তবলা আমি নিচ্ছি—সেই সঙ্গে তোমাকেও আমি চাই।

অর্জ্জুন ॥ আমাকে?

রতন ॥ তুমি না হ'লে জমবে না। এস।

একরকম জোর করিয়াই বাঈজী অর্জ্জুনকে তাঁবুর ভিতরে লইয়া গেল।

* * * *

তাঁবুর ভিতরে বাঈজীর খাসকামরায় অর্জ্জুন ও রতনের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

রতন ॥ কত দাম?

অর্জ্জুন ॥ দশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম নন্দনপুরের গঞ্জে। তা আপনি না হয়—

রতন ॥ কুড়ি টাকা দেব আমি।

অর্জ্জুন ॥ কুড়ি! এত!

রতন ॥ (ব্যাগ হইতে টাকা বাহির করিয়া) হ্যাঁ, বেশী নয়—নাও।

অর্জ্জুন ॥ (বিস্মিত হইয়া) না—মানে—এত টাকা আপনি কেন দেবেন?

বাঈজী নিকটে আসিয়া অর্জ্জুনের হাত ধরিল, টাকাগুলি তাহার মুঠার মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া কহিল—

রতন ॥ কেন? তবলা সত্যি খুব ভাল—আরো ভাল তোমার হাত। আর (হাসিয়া) সবচেয়েও ভাল তুমি!

অর্জ্জুন ॥ (হতভম্ব হইয়া) আমি! আপনি—

রতন ॥ হ্যাঁ, তোমাকে আমি চাই। তোমাকে না হ'লে আমার নাচ জমবে না। এস।

অর্জ্জুনের মনের অবস্থা বর্ণনাতীত। আনন্দে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইবার তাহার আর কিছুমাত্র বাকি নাই! সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে?

তারা ॥ কি করবে ও?

রতন ॥ বাজাবে। এস।

টানিতে টানিতে অর্জ্জুনকে মজলিসের দিকে লইয়া চলিল। তারা ও যমুনা হাসিয়া গড়িয়া পড়িতে লাগিল।

* * * *

এইমাত্র নাচের মজলিস ভাঙিয়াছে। প্রেক্ষাগারের সম্মুখস্থ মঞ্চের যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে। বাঈজী আসিয়া অর্জ্জুনের হাত ধরিল। যমুনা ও তারা অন্তরাল হইতে সবই লক্ষ্য করিতেছিল। সম্মুখে টেবিলের উপরে এক থালা খাবার।

রতন ॥ কথায় বলে, গোবরে পদ্মফুল! তুমি তাই। বোস।

অর্জ্জুন ॥ (বসিয়া) কি বাজিয়েছি জানি না, আমার জ্ঞান ছিল না।

বাঈজী ॥ (আরও নিকটে আসিয়া) আমারও জ্ঞান ছিল না। ও কি! হাত তুলে রইলে যে? খাও!

অর্জ্জুন ॥ হ্যাঁ খাব। আজ সারাদিন কিছু খাইনি।

খাওয়া সুরু করিল

রতন ॥ কি ভাবছ ওস্তাদ?

অর্জ্জুন ॥ এত ভাল খাবার আমি জীবনে খাইনি,—আমি দেখিনি কোনদিন।

রতন ॥ কি আর ভাল খাবার! এখানে কি-ই বা জোটে। কলকাতায় এস, দেখবে—খাবার কা'কে বলে।

অর্জ্জুন ॥ কলকাতা! সেই ছেলেবেলায় একবার গিয়েছিলাম। ওরে বাব্বা, কি মস্ত সহর!

রতন ॥ যাবে—আমার সঙ্গে যাবে?

অর্জ্জুন ॥ তোমার সঙ্গে! কলকাতা! না না, আমি বাড়ী চললাম বাঈজী। এসব আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

অর্জ্জুন ভাবিল, ইহা কি স্বপ্ন! পরক্ষণেই মনে হইল, হয়তো সে বুঝিতে ভুল করিয়াছে।

রতন ॥ কি বিশ্বাস হচ্ছে না ?

অর্জ্জুন ॥ এই—এই সব কিছু।

অন্যদিকে মুখ ফিরাইল অর্জ্জুন

রতন ॥ আমার দিকে তাকাও তো।

অর্জ্জুনের হাত ধরিয়া তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

এবার বল—এখনো কি বিশ্বাস হচ্ছে না ?

অর্জ্জুন ॥ (অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়া) না—না—

রতন কি ?

অর্জ্জুন ॥ আমায় ছাড় !

অর্জ্জুন উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল—রতন অবাক হইয়া তাহার গতিপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল।

* * * *

এদিকে বৃদ্ধ পরাণ গত দিবারাত্রব্যাপী অত্যাচার ও অনিয়মে ঘোর অসুস্থ। জ্বরের সন্তাপে মনের পুঞ্জীভূত অনেক দুঃখ অনেক ক্ষোভ প্রকাশ পাইতেছে—বিলাপ ও প্রলাপের আকারে। সে তাহার সাবেক কুয়োর জলের জন্য সেই মামুলি বায়না ধরিয়াছে—ঐ জলের মায়া কাটাইতে সে জীবন থাকিতে পারিবে না ! দুর্গা জল আনিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে রাখিয়াছে ; কিন্তু বৃদ্ধের বিশ্বাস—দুর্গা নিশ্চয়ই অন্য কুয়ার জল আনিয়া তাহার সহিত ছলনা করিতেছে।

দুর্গা ॥ সত্যি বলছি বাবা, এ জল তোমার সাবেক কুয়োর—তুমি খেলেই বুঝবে।

পরাণ ॥ (জলপান করিয়া) আঃ বাঁচলাম। মা, আমার কাছে একটু বস। মা, আমার হ'য়ে এসেছে।...লক্ষ্মণ—

লক্ষ্মণ ॥ দাদু!

পরাণ ॥ কি করছ দাদু! আমার কাছে একটু এস। তোর দাদু চলল।

লক্ষ্মণ ॥ কোথায় দাদু?

পরাণ ॥ যে-দেশে মহাজন নেই রে, সেই দেশে।...আয়, কাছে আয়, আমাদের সাবেক বাড়ীটা দেখেছিস?

লক্ষ্মণ ॥ দেখেছি দাদু।

পরাণ ॥ সুদের সুদ তস্য সুদ ধ'রে—দেনার দায়ে মহাজন আমার ঐ বাড়ী কেড়ে নিয়েছে। রামায়ণের গল্প শুনেছিস তো! সীতাকে যেমন ক'রে কেড়ে নিয়েছিল—তেমনি! কিন্তু লক্ষ্মণ চুপ ক'রে ব'সে ছিল?

লক্ষ্মণ ॥ না, যুদ্ধ ক'রে ইন্দ্রজিতকে মেরে ফেললে।

পরাণ ॥ তুই পারবি না তোদের সীতা—আমার ঐ সাবেক ভিটে তেমনি ক'রে উদ্ধার করতে?

লক্ষ্মণ ॥ পারব দাদু, পারব—পারব।

পরাণ ॥ তোরা আমায় ধ'রে ঐ ভিটেয় একটিবার নিয়ে যাবি?

লক্ষ্মণ ॥ নেব দাদু।

দুর্গা ॥ না বাবা, তাতে বিপদ আছে। আর শরীরেও সইবে না।

পরাণ ॥ আমি বলছি—সইবে। আমার শরীর আমি জানি নে? কথা রাখ—আমার শেষ কথা—

দুর্গা ॥ না বাবা, কিছুতেই তা হয় না। আপনার ছেলে আসুক—তারপর দেখা যাবে।

পরাণ ॥ পাজী—স'রে যা আমার সামনে থেকে।

দুর্গা মহাবিপদে পড়িয়া গেল—এখন কি করিবে সে! ব্যস্ত হইয়া লক্ষ্মণকে পাঠাইল অর্জ্জুনের খোঁজ করিতে। নিজে বারবার কুটিরের বাহিরে গিয়া দেখিতে লাগিল। এইভাবে সে কখনও বাহিরে, কখনও ভিতরে, কখনও পথে গিয়া দাঁড়ায়। হঠাৎ দেখিল, সত্যই আসিতেছে অর্জ্জুন। নিকটে আসিয়া অর্জ্জুন এক মুঠো টাকা দুর্গার হাতে দিল।

অর্জ্জুন ॥ এত টাকা কোনদিন চোখে দেখনি বল তো? দেখ কত টাকা! নাও, গুনে বাক্সে তোল। খাজনার ভাবনা এবার গেল।

দুর্গা ॥ কিন্তু তোমার তবলাজোড়াও যে গেল! সখের জিনিষ ঐ একটি ছিল—তাও গেল!

অর্জ্জুন ॥ তুমি যখন আছ, তখন আমার সব আছে।

দুর্গা ॥ এসব কথা শোনার সময় আমার নেই—এদিকে যে বাবার এখন-তখন। রোখ হয়েছে—সাবেক ভিটেয় গিয়ে মরবেন। আমি কোন রকমে ঠেকিয়ে রেখেছি। এস—একবার দেখবে এস।

উভয়ে কুটিরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বৃদ্ধের শয্যা শূন্য।

অর্জ্জুন ॥ (বিমূঢ়ভাবে) কৈ?

দুর্গা ॥ তাহলে!…তবে কি!…ওগো, তুমি শীগ্‌গির যাও সাবেক ভিটেয়—শীগ্‌গির যাও।…না-জানি কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

উভয়ে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল

*　　　*　　　*　　　*

নিশ্চিত মৃত্যুপণ করিয়া বিকারের ঘোরে পিতৃপুরুষের ভিটার মাটিতে পড়িয়া শেষ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে বৃদ্ধ পরাণ। তথাপি এই অন্তিম মুহূর্তে বৃদ্ধের একমাত্র শান্তি এই যে, যেখানে সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথম অরুণ-আলোর দেখা পাইয়াছিল—তাহার এই বিড়ম্বিত জীবনের অন্তসিন্ধুতীরে সেই ভিটার ধূলিতে সর্ব্বাঙ্গ ধূসরিত করিয়া যাত্রা করিতেছে। এই মৃত্যুই ছিল তাহার একমাত্র কাম্য।

অর্জ্জুন ॥ (পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া) বাবা—বাবা !

বৃদ্ধ অর্জ্জুনের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। তাহার দুই চক্ষুকোটর হইতে জল গড়াইয়া পড়িল।

পরাণ ॥ আঃ, কি শান্তি ! কি শান্তি ! একটু জল—সাবেক কুয়োর একটু জল—

দুর্গা অঝোরধারায় কাঁদিতেছিল

দুর্গা ॥ হ্যাঁ, আনছি—আনছি, জল আনছি—

ছুটিয়া জল আনিতে গেল

পরাণ ॥ (অর্জ্জুনকে) আয়—কাছে আয় বাবা ! কতদিন তোকে কত দুঃখ দিয়েছি—কত গালমন্দ দিয়েছি তোকে ;—কিন্তু আর না। আমার সাতপুরুষের ভিটে আজ আমাকে টেনে এনেছে ! শোন—শোন, কান পেতে শোন, তোর মা এসেছে—আমাকে ডাকছে, তোর দাদু এসেছে—আমাকে ডাকছে ! ঐ—ঐ সব…জল—উঃ—জল—জল—

বাবা! বাবা!!

গা জল লইয়া পাগলের মত ছুটিয়া আসিল

দুর্গা ॥ জল এনেছি—জল এনেছি—বাবা—বাবা!

দুর্গা বুঝিল, তাহার সম্মুখে প্রাণহীন দেহ। জলের পাত্র তাহার হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল।

* * * *

বেলা দ্বিপ্রহর। অর্জ্জুন মাঠ হইতে তখনও বাড়ীতে ফিরিবার অবকাশ পায় নাই। দুর্গা তাহার প্রতীক্ষায় অনর্থক বসিয়া থাকিয়া অবশেষে ভাত ও জল লইয়া লক্ষ্মণের সঙ্গে অর্জ্জুনের উদ্দেশ্যে রওনা হইল। মাঠে পৌঁছিয়া দেখিল, অর্জ্জুন তখনও কর্ম্মব্যস্ত। দুর্গাকে দেখিয়া অর্জ্জুন কহিল—

অর্জ্জুন ॥ তুমি আবার খাবার বয়ে আনলে কেন? আমি তো এক্ষুনি বাড়ী যেতাম।

দুর্গা ॥ বেলা পড়ে গেল, তাই—

অর্জ্জুন ॥ লক্ষ্মণ খেয়েছিস?

লক্ষ্মণ ॥ আমি খেয়েছি। মা খায়নি।

অর্জ্জুন ॥ ভারী অন্যায় হ'য়ে গেছে দুর্গা—আমার খেয়াল ছিল না।

লক্ষ্মণ ॥ বাবা, দেখেছ কারা আসছে?

অপরিচিত লোকজন দেখিয়া দুর্গা চলিয়া গেল

অর্জ্জুন ॥ তাই তো! এ যে বাঈজীর লোক দেখছি!

দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিল বাঈজীর মোসাহেবগণ—ভানু, জহর ও অজিত।

অদূরে রজ্জুবদ্ধ 'রাজা'কে দেখিয়া তাহারা সকলেই দন্ত বিকশিত করিয়া ফেলিল ও পরস্পর বিশেষ একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টির বিনিময় করিতে লাগিল।

ভানু ॥ ও বাবা, এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল!

জহর ॥ আরে আরে, এ যে ওস্তাদ যে!

অর্জ্জুন ॥ তা তোমরা এদিকে কোথায়?

তিন মোসাহেব ॥ (সমস্বরে) আমাদের চাই একটা পিসী—
না হয় একটা মাসী—
নিদেন একটা খাসী!

জহর ॥ হঁ্যা বাবা! তোমাদের এই পোড়া দেশে এসে যে পেট একেবারে গড়ের মাঠ হ'য়ে গেল বাবা।

ভানু ॥ ভাল-মন্দ কিছুই জুটছে না।

জহর ॥ না মাছ—না মাংস। কি নিরিমিষ দেশ রে বাবা!

অজিত ॥ আচ্ছা, এদেশে তোমরা সবাই কি বিধবা বাবা?

জহর ॥ নয় তো কি? তাই একটা মাসী-পিসা যা জোটে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ভানু ॥ আমিষ না হয় নিরামিষই হোক। একটু ক্ষীর, একটু সর, একটু রাবড়ি—

অজিত ॥ আরে রেখে দে তোর ক্ষীর-সর-রাবড়ি। সামনে এমন পুরুষ্টু খাসী—আহাহা, জিভে জল আসছে গো!

লক্ষ্মণ দেখিল, এই লোকগুলির কথাবার্ত্তা তো বড় ভাল নয়, তাই সে দস্তুরমত ভয় পাইয়া গেল। তাহার রাজাকে খাইতে চায় ঐ রাক্ষস ব্যাটারা!

লক্ষ্মণ ॥ (রাজাকে জড়াইয়া ধরিয়া) আমি বাড়ী যাব বাবা।

জহর ॥ ওস্তাদের ছেলে বুঝি? খাসা ছেলে! খাসা খাসী, বুঝলে ওস্তাদ,— বাঈজী ভারী খুসী হবে। তোমার কথাই ব'লে দিলে কিনা। বললে—

অজিত ॥ ওস্তাদের কাছে যাও—গিয়ে বল, ভাত তো আর মুখে রোচে না। সত্যি ওস্তাদ, বাঈজীর বড় কষ্ট হচ্ছে। খাসীটা দাও।

লক্ষ্মণ ॥ (বিপন্ন হইয়া) বাবা—

জহর ॥ ও বাবা!

অর্জ্জুন ॥ ওটা হ'ল গিয়ে লক্ষ্মণের খাসী—নিজে না খেয়ে ওকে খাওযায়।

ভানু ॥ তা বটে, তা বটে,—তবে কি-না—

জহর ॥ ঐ দেখ, আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। বাইজী তোমাকে ডেকেছে ওস্তাদ।

অর্জ্জুন ॥ আমাকে?

অজিত ॥ নয় তো কা'কে? কা'র জন্যে এই এক হাঁটু কাদা ভেঙে, এই ভূত সেজে এখানে এসেছি বাবা—নকর মণ্ডল, না কিনু সাঁওতাল?

ভানু ॥ মানে বুঝলে কিনা ওস্তাদ, বাঈজী তোমাকে দেখে, এই যাকে বলে গিয়ে, ফেঁসেছে!

অর্জ্জুন ॥ ছিঃ! কি যে বল!

অজিত ॥ ও বাবা, দর বাড়ানো হচ্ছে!

অর্জ্জুন ॥ না না, তা নয়, তবে কিনা—

জহর ॥ গানও জমছে না, নাচও জমছে না। তুমি, ওস্তাদ, সঙ্গত না করলে বাঈজীর আর মন উঠছে না।

ভানু ॥ তুমি না গেলে কি হবে জান? তুমি না গেলে আমাদের তাঁবু গুটোতে হবে।

অজিত ॥ শেষে এমনি ক'রেই আমাদের ডুবোবে ভায়া ?

ভানু ॥ খাসীও পাব না—তুমিও যাবে না ! তোমার মনে এই ছিল ওস্তাদ ?

জহর ॥ আহা, চল চল—একবার চলই না ! বাঈজী কি তোমাকে খেয়ে ফেলবে ?

অজিত ॥ তুমি না গেলে কি হবে জান ওস্তাদ ? বাঈজী আমাদের মুখ-দর্শন করবে না ! চল।

তাহারা অর্জ্জুনকে টানিয়া লইয়া চলিল

*   *   *   *

অর্জ্জুনকে পাকড়াও করিয়া বাঈজীর তাঁবুতে একে একে প্রবেশ করিল মোসাহেবের দল। সাফল্যের আনন্দে তাহাদের মন ভরপুর। বাঈজী যে যখন-তখন বিনা কারণে তাহাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে—এইবার দেখুক সে তাহাদের হাতযশ। তাহাদের কোন দাম আছে কিনা, এইবার বুঝুক বাঈজী। ফলাও করিয়া সোৎসাহে উৎসাহে তাহারা বাঈজীকে শুনাইতে লাগিল—কত কষ্টে—কি কৌশলে শিকার করায়ত্ত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া বাঈজীর সমীপে পৌছিয়াছে।

রতন ॥ আচ্ছা, তা হ'লে তোমরা এখন এস। আমি ওর সঙ্গে দুটো মনের কথা বলি।

যমুনা ॥ (খিল্‌খিল্‌ হাসিয়া) দেখিস রতনদি, বেফাঁস কিছু বলিসনি।

তারা ॥ মনের কথা বলবে বল—মন দিও না যেন !

দুজনে খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল

অজিত ॥ ও বাবা, মনের কথা বলবে গোপনে !

জহর ॥ তা বটেই তো—তা বটেই তো—

শ্যামলাল ॥ বল বাবা, বল—মনের কথা বল; কিন্তু তার আগে সেই চারপেয়ের কথাটা একবার বল বাঈজী।

রতন ও অর্জ্জুন ছাড়া সকলে চলিয়া গেল

রতন ॥ দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস!

অর্জ্জুন ॥ ওরা যে বললে—তা কি সত্যি? সত্যিই কি তুমি আমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলে?

রতন ॥ নইলে তো তুমি আসতে না? সেই যে গেলে, আর তো এলে না!

অর্জ্জুন ॥ আসতে চাইলেই কি আসতে পারি? আমার চাষবাস আছে, স্ত্রী-পুত্র আছে—ভাত জোটে না—নাচ দেখব!

রতন ॥ চাষবাসে ভাত না জুটলে, সে-চাষবাস ক'রে লাভ?

অর্জ্জুন ॥ তোমার নাচ দেখলে ভাত জুটবে?

রতন ॥ (হাসিয়া) জুটবে। নাচের তালে তালে মিঠে হাতে তবলা বাজালে, তা জুটবে বৈকি।

অর্জ্জুন ॥ তার মানে—চাকরি করতে বলছ তোমার?

রতন ॥ ভালোবেসে যদি না আস, তবে তোমাকে টাকা দিয়েই আমাকে রাখতে হয় ওস্তাদ।

অর্জ্জুন ॥ কলকাতার এত বড় নামকরা বাঈজী তুমি—পাড়াগেঁয়ে এক চাষীর সঙ্গত তোমার ভাল লাগল—এ-কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

রতন ॥ টাকা দিয়ে রাখতে চাইছি—অবিশ্বাসের কি আছে ওস্তাদ? (নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া) আমার সঙ্গে চল কলকাতায়। তোমার হাতে যাদু আছে ওস্তাদ। আর তোমার চোখে—তোমার হাতে মধু। তুমি যাদুকর!

বাঈজীর কণ্ঠ কম্পিত, তাহার চক্ষে লালসার চরম অভিব্যক্তি। অর্জ্জুনের পিঠে হাত রাখিয়া সম্মোহন দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল বাঈজী তাহার মুখের পানে। বাঈজীর বাহুপাশে আবদ্ধ অর্জ্জুনের সে-কি ভীষণ পরীক্ষা! অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইল অর্জ্জুন। এক দিকে তাহার সমাজ সংসার, তাহার দুর্গা ও লক্ষ্মণ, অন্য দিকে এই প্রলোভন!

অর্জ্জুন ॥ (নিজেকে মুক্ত করিয়া) না—না, অমন ক'রে তুমি বোলো না। আজ আমি যাই। আমার দুর্গা—আমার লক্ষ্মণ—তারা আমার পথচেয়ে বসে আছে। তাদের আমি বুঝতে পারি—কিন্তু—কিন্তু তোমাকে আমি বুঝি না বাঈজী।

মোসাহেব-চতুষ্টয় গাদাগাদি ভীড় করিয়া অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছিল—সকলে একসঙ্গে গলা-খাঁকারি দিয়া উঠিল। রতন সে দিকে তাকাইতে—সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

অজিত ॥ আসব? 'মে উই কাম্ ইন্ প্লিজ্?'

রতন ॥ এস! তোমরা ভারী বেরসিক!

শ্যামলাল ॥ না এসে যে পারলাম না—তাই এসেছি। তাল কাটল বুঝি?

রতন ॥ কি হয়েছে?

অজিত ॥ মেলাতে এক ডজন বুড়ো খাসী এসেছে, কিন্তু ওস্তাদের খাসীর মত পুরুষ্টু খাসী একটিও নেই। তাই বলছি কি—

জহর ॥ কি বলছ?

অজিত ॥ বলছি যে, ঐ খাসীটা ওস্তাদ দেবে, না, একটা বুড়ো খাসীই আনব?

শ্যাম ॥ আর, ওস্তাদ, দাম নিতে চাও—নাও।

অজিত ॥ বাঈজীর খাবার কষ্ট তো আর এই পোড়া চোখে দেখতে পারি নে। সত্যি ভারী কষ্ট—দেখে জল আসে চোখে—নোনা জল! এই দেখ—

রতন ॥ কি যা-তা বলছ? না ওস্তাদ, খাবার কষ্ট আমার কিছুই নেই। আমার যা কষ্ট, তা তুমি বুঝবে না (বিচিত্র হাসি)।

অজিত ॥ ও রে বাবা! 'কেস্' বড় খারাপ! 'হোপলেস্'!

*　　　*　　　*　　　*

গভীর রাত্রি। লক্ষ্মণ নিদ্রিত। দুর্গার চোখে ঘুম নাই—অর্জ্জুন এখনও বাড়ী ফিরে নাই। দুর্গা জানিতে পারিয়াছে, বাঈজীর লোক আসিয়া নাকি অর্জ্জুনকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। কখন সে আসিবে কে জানে? হঠাৎ বাহিরে গোয়ালঘরের দিক হইতে কি যেন একটা শব্দ দুর্গার কানে আসিল। দুর্গা ডাকিল—

দুর্গা ॥ কে?

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মুহূর্ত্তপরে বাহিরে আবার ঐরূপ শব্দ। দুর্গা ভয়ে ভয়ে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া অস্পষ্ট আলোকে দেখিল, একটি ছায়ামূর্ত্তি—গোয়ালঘরের সম্মুখে। দুর্গা চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই ছায়ামূর্ত্তি-অর্জ্জুনের সাড়া পাওয়া গেল—

অর্জ্জুন ॥ ভয় নেই—আমি।

দুর্গা ॥ তুমি! এখানে?

অর্জ্জুন ॥ ও! হ্যাঁ—আমি।

দুর্গা ॥ তা অন্ধকারে কেন ? আমি ভাবছিলাম—কে !

অর্জ্জুন ॥ ভাবছিলে চোর, না ?

দুর্গা ॥ না, ঠিক তা নয়,—তবে—

অর্জ্জুন ॥ লক্ষ্মণ ঘুমিয়েছে ?

দুর্গা ॥ তোমার জন্যে অনেকক্ষণ জেগে বসেছিল।

অর্জ্জুন ॥ তুমি খাওনি ?

দুর্গা ॥ তুমিও তো খাওনি।

অর্জ্জুন ॥ চল যাচ্ছি। বাতিটা এদিকে ধর। খাসীটাকে বাঁধোনি। বাতিটা আমার হাতে দাও। খাসীটাকে বাঁধো—এমন ক'রে বাঁধো যেন চোরে খুলে নিতে না পারে।

* * * *

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। দুর্গা ও লক্ষ্মণ গভীর ঘুমে অচেতন। কিন্তু এ কি হইল অর্জ্জুনের ? চিন্তার পর চিন্তায় তাহার উষ্ণ মস্তিষ্ক আলোড়িত। কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে হঠাৎ চুপিচুপি দরজা খুলিয়া সে বাহির হইল। পরমুহূর্ত্তে কি-একটা শব্দে দুর্গারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অন্ধকারে অর্জ্জুনের শয্যায় হাত বুলাইয়া বুঝিল, তাহার আশঙ্কা অমূলক নয়। খোলা দরজা দিয়া দুর্গাও দাওয়ায় নামিল। দেখা গেল, গোয়ালঘর হইতে রাজাকে কোলে লইয়া বাহিরে আসিল অর্জ্জুন। দুর্গার বজ্রাহতবৎ অবস্থা। ঘোর অন্ধকারে অর্জ্জুন অদৃশ্য হইয়া গেল। নীরব চলচ্চিত্রের মত এই যে ঘটনা সংঘটিত হইল, ইহার নায়ক জানিতেও পারিল না যে, তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া আরও একটি লোক নীরবে মর্ম্মভেদী

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে—তাহার অধঃপতনের এই প্রথম সোপানে।

*   *   *   *

এইমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। বিনিদ্র-রাত্রিযাপনের পর দুর্গা ভগ্নমনে গৃহকর্ম্ম করিয়া যাইতেছে—যেন কতকটা অভ্যাসের বশে আর নেশার ঝোঁকে। লক্ষ্মণের এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। তাহাকে ডাকিতে গিয়া দুর্গা দেখিল, লক্ষ্মণ শয্যায় ব'সিয়া চক্ষু মুছিতেছে। লক্ষ্মণ কহিল—

লক্ষ্মণ ॥ মা, আমি বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি মা।

দুর্গা ॥ সে কি রে?

লক্ষ্মণ ॥ হ্যাঁ! কালকের সেই বাঈজীর লোকগুলোকে তো তুমি ভাল ক'রে দেখনি। কি যে খারাপ চেহারা তাদের! রাজাকে তারা কেটে খেতে চায়—এমনি রাক্ষস ওরা!

দুর্গা ॥ (হাসির ভান করিয়া)—তাই কি?

লক্ষ্মণ ॥ স্বপ্ন দেখলুম, ব্যাটারা রাজাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে ঐ মেলায়—কাটবে ব'লে। (হঠাৎ) মা, সকালে বের করেছ রাজাকে? ওকে যে আমি কত-কি শেখাচ্ছি মা, দু'দিন পরেই তা দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে যাবে। মাত্র দু' পায়ে ভর ক'রে, দু'হাতে লাঠি নিয়ে পাহারাওয়ালার মত সারা উঠোন ঘুরে বেড়াবে! আমি যেমন বলব, 'এই পাহারাওয়ালা, সেলাম দাও'—অমনি হাতের লাঠি মাটিতে ঠেকিয়ে তার এক হাত কপালে ছোঁয়াবে।

দুর্গা ॥ (বালকের কথার গতির মোড় ফিরাইবার উদ্দেশ্যে) যা বাবা,

এখন হাত-মুখ ধুয়ে, মেলায় গিয়ে, তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়। নে বাবা, একটু শীগ্‌গির কর্‌।

লক্ষ্মণ বাহিরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই তাহার চীৎকার শোনা গেল—"মা! আমার রাজা!—রাজা কোথায় গেল?" লক্ষ্মণ ছুটিয়া আসিয়া মা'র বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

দুর্গা॥ কাঁদিসনে—তোর বাবা থাকতে কেউ ওকে কাটতে পারবে না। যা, মেলায় গিয়ে তোর বাবাকে সব বল্‌—তা হ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর, তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আয়। যা বাবা!

*　　　　*　　　　*　　　　*

বাঈজীর তাঁবুর সম্মুখে সমস্বরে কলরব করিয়া মোসাহেবগণ অর্জ্জুনের অভ্যর্থনা করিল।

অজিত॥ এই যে ওস্তাদজী, আইয়ে—বৈঠিয়ে।

ভানু॥ (সুর করিয়া) আজু রজনী হাম-ভাগে পোহায়নু পেখনু য়ামুখ-চন্দা।

জহর॥ বাঃ বাঃ—তা এ মুখ-চন্দাটা কোন্‌ পিযার? ওস্তাদজীর, না ঐ খাসীর?

ভানু॥ উভয়ের। আর জানতো বাওয়া, এই—অধিকন্তু—

অজিত॥ ন দোষায়। তা যাই বল, আমাদের ওস্তাদজীর দিলের বহরটা দেখলে তো একবার? এ আমি আগেই জানতুম। কেবল কবে মরব, তাই জানি না।

বাকি দুইজনের সহিত একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া নিজের এই স্থূল রসিকতায় নিজেই হাসিয়া অস্থির।

জহর ॥ তা ওস্তাদজী, এমন স্পিকটি নট্ হয়ে ব'সে রইলে কেন বল তো ? এ দৃশ্য তো আমরা সইতে পারিনে। এইখানে লাগে।

বুক দেখাইল

ভানু ॥ ছেলেটার যে এমন সুবুদ্ধি হবে, ভাবতেও পারিনি।

অজিত ॥ বাপকো বেটা—হুঁ-হুঁ, কুছ্ নেহি তো থোড়া থোড়া। বুঝলে কিনা ?

অর্জ্জুন ॥ দেখুন মশাইরা, আমার মনের কথা বলবার নয়। খেতে চেয়েছিলেন, তাই এনে দিলাম। আপনারা খেলেই আমি খুসী হব। কিন্তু এ নিয়ে আর কথা বাড়াবেন না। আমি চললাম। বাঈজীকে বলবেন আমার কথা।

দ্রুতপদে চলিয়া গেল

* * * *

খাসীর হত্যাকাণ্ড নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়াছে—এখন দেহ হইতে চামড়া ছাড়ানো হইতেছে। এমন সময়ে দেখা গেল, উন্মত্তের মত এদিকে ছুটিয়া আসিতেছে লক্ষ্মণ। সারাপথ বালকের মুখে একটি মাত্র আর্ত্ত চীৎকার—"বাবা—বাবা !"

অজিত ॥ ঐ ওস্তাদের সেই ছেলেটি না ?

ভানু ॥ ওহে বাপু, ব্যাপার কি ? এমন হন্তদন্ত হয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?

লক্ষ্মণ ॥ তোমরা আমার বাবাকে দেখেছ ? আমার রাজাকে দেখেছ ?

সকলে দৃষ্টি-বিনিময় করিতে লাগিল

অজিত ॥ তা বাছা, দেখেছি—এই মাত্র তোমার বাবা—

ভানু ॥ আধ-কুড়ি টাকায়—

জহর ॥ (খাসীর দেহমাংসের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া) বিক্রী ক'রে হাওয়ার বেগে ছুটে গেল।

লক্ষ্মণ ॥ অ্যাঁ! (বালক ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল)

*　　*　　*　　*

নিজ পুত্রের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় খাসীটিকে চুরি করিয়া রাত্রির অন্ধকারে যেভাবে বাহির হইয়া গিয়াছিল অর্জ্জুন, এই দিনের আলোকেও চুপি চুপি তেমনি ভাবেই নিজ বাড়ীতে চোরের মত প্রবেশ করিল সে। কিন্তু যখন দেখিল, দুর্গা গৃহকর্ম্মে রত, তখন সে মনে মনে একটু আরামই বোধ করিল; কারণ ইহার বিপরীত দৃশ্যই সারাপথ সে কল্পনা করিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ দুর্গার সম্মুখে দাঁড়ানোই বা যায় কি করিয়া! তাই বিনা কারণে সে কাসিতে লাগিল। দুর্গা আড়চোখে তাহাকে দেখিয়াই নীরবে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। অর্জ্জুন প্রমাদ গণিল।

অর্জ্জুন ॥ লক্ষ্মণ! ওরে লক্ষ্মণ!

রান্নাঘরে গেল

এই—এই, লক্ষ্মণকে দেখেছ? খুব কাঁদছিল বুঝি?

দুর্গা নীরব

রাজার জন্যে লক্ষ্মণ খুব কাঁদছিল বুঝি?

দুর্গা নীরব

কি বলছিল লক্ষ্মণ? সে বুঝি আমার পেছনে ছুটে গিয়েছিল? দেখেছে সব?

দুর্গা নীরব

আমি কি করেছি শুনবে ?

দুর্গা নীরব

জানি—আমি জানি, আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করবে না। ঘেন্নায় আমার সঙ্গে কেউ কথা কইবে না, না ?

দুর্গা ॥ (অর্জ্জুনের মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে) আমায় কিছু বলছ ?

অর্জ্জুন ॥ (বিস্মিত হইয়া) তোমায় ? নাঃ !

(একটু পরে) কি আবার বলব ? বলবার আছেই বা কি ?…বেশ, আমার যা খুসী তাই করব—কাউকে আমি কৈফিয়ত দিতে পারব না। (জানালার নিকটে গিয়া) কৈফিয়ত ! কেন ? কি দোষটা আমার ?

(একটু পরে) তোমরা আমায় ছোট মনে করলেই কি আমি ছোট ? না, তা নয় গো ! গুণী ব'লে আমাকেও সবাই হাত ধ'রে টানাটানি করে। কিন্তু গাঁয়ের যোগী ভিখ্ পায় না—সে-কথা তো আর মিথ্যে নয়।

(একটু পরে) নাঃ—এই গাড়ুটা আবার গেল কোথায় ? পোড়া বাড়ীতে কিছুই যদি হাতের কাছে পাবার জো আছে !

গাড়ুর খোঁজে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

ওদিক দিয়া লক্ষ্মণ বাড়ীতে ঢুকিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেচারি চোখ ফুলাইয়াছে। লক্ষ্মণের সাড়া পাইয়া দুর্গা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

লক্ষ্মণ ॥ (কাঁদিতে কাঁদিতে) বাবা রাজাকে কেটে ফেলেছে মা।— আমাকেও তোমরা মেরে ফেল মা।

দুর্গা (দুলেকে বুকের কাছে টানিয়া) ছিঃ, বাবা, কাঁদতে নেই—ছিঃ !

লক্ষ্মণ ॥ কেন রাজাকে তবে কাটল বাবা ? (কান্না)

দুর্গা ॥ কাঁদিস না বাবা, কাঁদিস না। তোর বাবার মাথার ঠিক নাই—তাই। আচ্ছা আচ্ছা, আবার একটা খাসী কিনে দেব তোকে—সত্যি বলছি।

লক্ষ্মণ ॥ (কাঁদিতে কাঁদিতে) না, আমি নেব না। চাই না আমি অন্য খাসী। আমি আমার রাজাকে চাই। রাজা—রাজা !

দুর্গা ॥ ছি বাবা, বুড়ো ছেলে হয়ে কাঁদিস তুই ! ছিঃ।

অর্জ্জুন অন্তরাল হইতে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। লক্ষ্মণের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে এদিকে একটু সরিয়া আসিলে—লক্ষ্মণ তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র দুর্গার বাহুপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বাটীর সম্মুখস্থ পথে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

অর্জ্জুন ॥ কোথায় গেল ?

দুর্গা ॥ জানি না।

অর্জ্জুন ॥ আর-একটা খাসী কি আমি কিনে দিতে পারি না ?

দুর্গা অর্জ্জুনের মুখের দিকে ক্ষণেক তাকাইয়াই আবার নিজের কাজে মন দিল।

তাকে বুঝিয়ে বললেই তো পার।·· কে বলবে !

(হঠাৎ নরম হইয়া) দুর্গা, ও খাসী আমাদের জন্যে নয়। যাদের খাবার তারাই খেয়েছে।

দুর্গা নীরব

(আরও নরম হইয়া) আচ্ছা, দুর্গা, বাতাবিলেবুর চা᾽᾽াটি যেন শুকিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।

দুর্গা নীরব

(একটু রাগের ভান করিয়া) আমি জানি, কেউ কোন জিনিষের যত্ন নেবে না। ঘরের চালা দিয়ে জল প'ড়ে প'ড়ে ঘর ভেসে যাক্—চাল প'ড়ে যাক্! বলি, বলবে তো কোন্ জায়গা দিয়ে জল পড়ে।
(একটু পরে) নাঃ কেউ কিছু বলবে না, আর যত দোষ আমার।

দাওয়ায় গিয়া বসিল

(আপন মনে) তা আর-একটা খাসী কিনলেই তো হ'ল? দেখে এসেছি—ওর চেয়েও ভাল। টাকার জন্যে আমি ভয় করি না। যেখান থেকে হোক আমি টাকার জোগাড় করব।
(গলার স্বর এক পর্দ্দা চড়াইয়া) লক্ষ্মণকে এ-কথা ব'লে বাড়ীতে ডেকে আনলেই তো হয়।

* * * *

বাড়ীর সম্মুখে পথের উপর বসিয়া লক্ষ্মণ সেই একই ভাবে কাঁদিতেছে। দুর্গা আসিয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইল।

দুর্গা॥ বাড়ী আয় লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ॥ না! (কান্না)

দুর্গা॥ ছিঃ, বাবা, এমন অবুঝ হোয়ো না।

লক্ষ্মণ॥ বাবা আছে?

দুর্গা॥ হ্যাঁ আছেন—ঘরের ভেতর। যাও বাবা, কাছে যাও।

লক্ষ্মণ॥ না মা, বাবার কাছে আমি আর যাব না। বাবা আমায় মোটেই ভালবাসে না। বাবা আমার রাজাকে কেটেছে।

লক্ষ্মণকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া দুর্গা ভিতরে প্রবেশ করিল।

দুর্গা ॥ লক্ষ্মণ এসেছে, ওকে তুমি একটিবার বুকে নাও। বুঝলে না —ছেলেমানুষ!

অর্জ্জুন ॥ আমি আসছি—আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি।

ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল

*　　*　　*　　*

অর্জ্জুন পুনরায় মেলায় আসিয়াছে পুত্রের জন্য আর-একটি খাসী কিনিতে। খাসীওয়ালার সঙ্গে তাহার কথাবার্ত্তা চলিতেছে—

অর্জ্জুন ॥ হ্যাঁ, এইটা—এটার দাম?

দোকানী ॥ পনেরো টাকা।

অর্জ্জুন ॥ পনেরো টাকা!

দোকানী ॥ মশাই, দামের কথা আর বলবেন না। একজোড়া কড়িং ধ'রে বাজারে গিয়ে বসুন—দু'টাকা দাম পাবেন। আর এ তো হ'ল গিয়ে খাসী।

অর্জ্জুন ॥ হুঁ!

ক্ষুণ্ণ মনে চলিতে লাগিল

*　　*　　*　　*

লক্ষ্মীর কৌটা শূন্য করিয়া দুর্গার অজ্ঞাতসারে লওয়া তিনটি টাকাই ছিল আজ অর্জ্জুনের একমাত্র সম্বল, কিন্তু ঐরূপে তাহাকে নিরাশ হইতে হইল। লক্ষ্মণের প্রার্থিত বস্তু পনেরো টাকার কমে পাওয়া সম্ভব নয়। অন্যমনস্ক হইয়া পথ চলিতে চলিতে কখন যে সে জুয়ার

আড্ডার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা তাহার নিজেরই খেয়াল ছিল না। হঠাৎ খেয়াল হইল— ঐখানে তাহার ভাগ্যপরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয় না? পরবর্ত্তী ঘটনা অতি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত। দুর্গার বড় যত্নে রাখা লক্ষীর কৌটার সিন্দুরলিপ্ত টাকা তিনটি গিয়া উঠিল জুয়াড়ির চর্ম্মপেটিকায়।

* * * *

রতনবাঈজীর তাঁবুর সম্মুখে আজ কান পাতিবার উপায় নাই। মোসাহেববর্গ ঢাক-কাড়া-নাকাড়া—সর্বকিছু-সহযোগে তারস্বরে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী-সহকারে ঘোষণা করিতেছিল, আগামী কল্যই বাঈজীর 'ষ্ট্রাইক্ দি টেণ্ট্' অর্থাৎ তাঁবু উঠিয়া যাইবে—সুতরাং যদি কেহ বিলম্বে হতাশ হইতে না চায় তবে আজই—ইত্যাদি

ভানু ॥ দেখে যাও! দেখে যাও! আজকে বাদে কাল হবে না!

অহর ॥ চ'লে এস ভাইসব! সুরু হয়ে গেল! অদ্য রজনী শেষ রজনী।

ভানু ॥ দেখে যাও! দেখে যাও! দু'আনা আর চার আনার টিকিট্।

এমন সময় রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিল অর্জ্জুন। সকলে সমস্বরে কলরব করিয়া মহাসমাদরে তাহাকে তাঁবুর ভিতরে পাঠাইয়া দিল।

এদিকে বাহিরে জীবন নামে জনৈক সবুজ বাবু ভানুর সম্মুখে আসিয়া অতি মোলায়েম সুরে অনুনয়-বিনয়ের পালা সুরু করিল।

জীবন ॥ শুনছেন, ও মশাই?

ভানু ॥ কা'কে বলছ ভাই? আমাকে?

জীবন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

জহর ॥ কি বাবা, বল।

জীবন ॥ এই—এই—

অজিত ॥ বল বাবা, বল।

জীবন ॥ এই বলছিলাম—বলছিলাম কি, রতনবিবির সঙ্গে একবার দেখা করতে পাই ?

শ্যাম ॥ কেন মশাই ?

জীবন ॥ ওঁকে একবার প্রাণের ভক্তি জানাব।

জহর ও অজিত ॥ (কীর্ত্তনসুরে) সখী গো, ভক্তি জানাব !

শ্যাম ॥ ওরে বাবা, প্রাণের ভক্তি ! তা সে মনে-মনেই জানাবেন—কেমন ? এবার আসুন।

অজিত জীবনবাবুর মাথায় হাত রাখিয়া চাটি মারার ভঙ্গী করিতে লাগিল

* * * *

তাঁবুর ভিতরে বাঈজীর খাস-কামরায় রতন ও অর্জ্জুন

রতন ॥ কাল যে হঠাৎ চ'লে গেলে—আমায় পায়ে ঠেলে ?

অর্জ্জুন ॥ পায়ে ঠেলবার মত মানুষ তুমি নও। আমার কথা ধোরো না বাঈজী ; আমি ভাবি এক, করি আর।

রতন ॥ আমরা কাল চ'লে যাচ্ছি—আর হয়তো দেখা হবে না। আমায় তুমি ভুলে যেয়ো।

অর্জ্জুন ॥ ভুলতেই চেয়েছিলাম ; কিন্তু পারলাম না।

রতন ॥ না না, তুমি আমাকে ভুলে যেয়ো। তোমার ঘর আছে, সংসার আছে, ছেলে আছে, বৌ আছে, কিন্তু আমার ? না না তুমি যাও, অনেক রাত হয়েছে—তুমি এবার এস।

বাঈজী পিছন ফিরিল

অর্জ্জুন ॥ রতনবাঈ ! দাঁড়াও ।

অর্জ্জুনের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল বাঈজী

তারা ও যমুনা পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া দেখিতেছিল

আমার সব আছে রতনবাঈ, তবু কিছুই যেন নাই । কেন জান ? আমার টাকা নাই । যার টাকা নাই, তার কিছুই নাই । বাড়ী ফেরবার কোন মুখ নাই । স্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়াব, ছেলেকে বুকে নেব—এ অধিকারও আমার নাই । আজ আমি তাদের ভুলতে চাই । আর, তাদের ভুলতে চাই ব'লেই আজ তোমাকে চাই !

হাস্যমুখে বাঈজী কাছে আসিয়া অর্জ্জুনের হাত ধরিল

* * * *

সারারাত্রি লক্ষ্মণের ঘুম হয় নাই । সকালে উঠিয়াই নিত্যকার অভ্যাসবশে সে গোয়ালঘরে গেল । তাহার বাবা সেই যে কাল মেলায় গিয়াছে, আর তাহার ফিরিবার নামটি নাই । যেখানে 'রাজা' বাঁধা থাকিত, সেই খালি জায়গাটা দেখিয়া তাহার মন আবার খারাপ হইয়া গেল । এমন সময় সে শুনিতে পাইল, দূরে একটা মোটরগাড়ীর শব্দ । কৌতূহলী বালক তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল । গাড়ী নিকটে আসিলে সে দেখিতে পাইল, গাড়ীর মধ্যে বাঈজীর পাশে বসিয়া আছে ও কে ? তাহার বাবা ? হ্যাঁ, তাইতো ! ব্যাকুল হইয়া সে অর্জ্জুনকে ডাকিতে লাগিল—

লক্ষ্মণ ॥ বাবা ! বাবা ! বাবা !—

লক্ষ্মণ দেখিল, অর্জ্জুন ড্রাইভারকে আরও জোরে গাড়ী চালাইতে বলিতেছে। বালক ব্যাকুল হইয়া দুর্গার নিকটে ছুটিয়া গিয়া কহিল—

লক্ষ্মণ ॥ মা! মা!

দুর্গা ॥ কি হ'ল রে?

লক্ষ্মণ ॥ (কাঁদিতে কাঁদিতে) ঐ যে, বাঈজীর সঙ্গে বাবা চ'লে যাচ্ছে!

দুর্গা নীরব। লক্ষ্মণ বাবাকে ফিরাইয়া আনিতে ব্যগ্র হইয়া গাড়ীর পিছনে ছুটিবার জন্য বাহিরে যাইতেছিল

দুর্গা ॥ কোথায় যাচ্ছিস?

লক্ষ্মণের হাত চাপিয়া ধরিল

লক্ষ্মণ ॥ বাবাকে ডেকে আনি মা।

দুর্গা ॥ (দৃঢ় কণ্ঠে) না, ভেতরে আয়।

কিন্তু তাহার মনের অবস্থা অন্তর্য্যামী বুঝিলেন। চোখের সম্মুখে ঘর বাড়ী সমস্ত সংসার যেন দুলিতে লাগিল।

* * * *

রতনবাঈজীর কলিকাতার বাটীর একটি নিভৃত কক্ষে জুয়ার আসর বসিয়াছে। বাঈজী নিজেও খেলায় ব্যাপৃত। দেখা যাইতেছে, অর্জ্জুন জানালার ধারে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার শূন্য দৃষ্টি বাহিরের উন্মুক্ত আকাশের দিকে। খেলা পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছে। টাকার ঝনৎকারে ও মোসাহেবদের হট্টগোলে কক্ষ সরগরম। বহিরাগত ভক্তগণ বাঈজীর মনরক্ষার জন্য আজ মোটা টাকা সঙ্গে আনিয়াছে, কারণ বাঈজীর নির্দ্দেশই এইরূপ। বাঈজীর মোসাহেবদের এবং বাঈজীর নিজেরও লোলুপ দৃষ্টি সেই দিকে। সহসা

সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল। নৃপতি নামে এক মোসাহেব ব্যস্ত হইয়া ভিতরে আসিয়া সংবাদ দিল—পুলিস আসিতেছে! মুহূর্ত্তে কক্ষের মধ্যে যেন একটা ওলট-পালট হইয়া গেল। জুয়ার সরঞ্জাম অদৃশ্য হইল—সকলে ভীত-ত্রস্ত হইয়া যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া গেল। বহিরাগত ভক্তগণ টাকার রাশি ফেলিয়া প্রাণের দায়ে পলাইল—কারণ তাহা কুড়াইয়া লইতেও সময়ের দরকার।

একটা চমকপ্রদ দৃশ্য-পরিবর্ত্তনের পর দেখা গেল, কক্ষে কেবলমাত্র অর্জ্জুন ও বাঈজী। অর্জ্জুন হতবুদ্ধি ও বাঈজীর মুখে মৃদুহাসি। পুলিস-বেশী মোসাহেবগণ উক্ত পলায়ত ভক্তবৃন্দের পরিত্যক্ত টাকাকড়ি কুড়াইয়া লইতেছিল।

* * * *

সেই সময়ে কল্যাণপুরে অর্জ্জুনের গৃহপ্রাঙ্গণে লক্ষ্মণ ও দুর্গার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। ইতিমধ্যে মহাজনের হাতে-পায়ে ধরিয়া দুর্গা লক্ষ্মণকে তাহার বাড়ীর গরুর রাখালের কাজে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছে। লক্ষ্মণ কাজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

দুর্গা ॥ এক্ষুনি যাচ্ছিস? একটু দাঁড়া। পান্তাভাত ক'টি খেয়ে যা। ফিরতে তো সেই বেলা যাবে।

লক্ষ্মণ ॥ না মা, দেরি হ'লে মহাজন ভারী বকে, বলে—মাইনে কাটবে, তাড়িয়ে দেবে। তুমি ভেবো না মা, টিয়া আমাকে কত মুড়িমুড়কি খাওয়ায়। তুমি গরুটাকে জল খাইয়ো মা—কেমন?

লক্ষ্মণ ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলে দেখা গেল, রুক্মিণী বক্ বক্ করিতে করিতে প্রবেশ করিল।

রুক্মিণী ॥ নাঃ, বাড়ীটা খাঁ-খাঁ করছে। এ বাড়ীতে আর পা দেওয়াই যায় না। কি ভাই, তোমার যে আর কাজই ফুরোয় না। বলি আর কা'র জন্তেই বা খেটে মরছ?

দুর্গা ॥ বস ভাই।

রুক্মিণী ॥ বাব্বাঃ! ঐ মানুষটার পেটে পেটে যে এত সয়তানী ছিল তা কে ভেবেছিল? এমন ভাব দেখাত যেন সংসারে দুর্গা ছাড়া আর কেউ নেই। শেষে কিনা সেই দুর্গাকে লাথি মেরে, বাঈজীর হাত ধ'রে ড্যাং ড্যাং ক'রে বেরিয়ে গেল! অমন সোয়ামীর মুখে ঝাঁটা।

দুর্গা ॥ তুমি ভুল করছ ভাই। চাষবাসে কিছু থাকে না দেখে তিনি রোজগার করতেই গেছেন।

রুক্মিণী ॥ অমনি পালিয়ে?

দুর্গা ॥ না না, পালিয়ে কেন, ব'লেই গেছেন ভাই।

রুক্মিণী ॥ ব'লেই গেছেন? ব'লে গেলে তুমি যেতে দিতে? তোমাকে আমি চিনি না? বাব্বা! আমার চোখে ধুলো দেবে তুমি?—সে অনেক দেরি।

দুর্গার প্রতি কুটিল কটাক্ষ করিল, কিন্তু মনে মনে খুসীই হইয়াছে—দুর্গার দুর্দ্দশা দেখিয়া। এতদিনে তাহার গুমোর ভাঙ্গিয়াছে—বেশ হইয়াছে! অর্জ্জুনের প্রতি মনে মনে আকৃষ্টা এই কৃষকরমণীর মুখে চাপাহাসির রেখা দেখা গেল।

দুর্গা ॥ যদি বলি, আমিই তাঁকে যেতে বলেছি—চাকরী করতে—টাকা রোজগার করতে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নয়, আরাম

ক'রে, আনন্দ ক'রে, কলকাতার মত সেরা জায়গায় সেরা তবলচি হয়ে—তাতে আমার লজ্জাটা কি ?

রুক্মিণী ॥ ওঃ ! বলি, টাকা রোজগার করতেই যদি সোয়ামীকে পাঠিয়েছ, তবে দুধের ছেলেটাকে মহাজনের ওখানে খাটতে পাঠিয়েছ কেন ? সোয়ামী নিয়ে যার এত গরব, না-খেয়ে মরলেও সে ও-কথা বলবে না। আমি জানি। যতই বল বিশ্বাস করব না—কেউ করবে না।

দুর্গা ॥ যেদিন একগাদা টাকা নিয়ে ঘরে ফিরবে, লোকে বিশ্বাস করবে তো ?

তা হয়তো করবে। তবে ভাই, একমণ তেলও পুড়ছে না—রাধাও নাচছে না। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তা বেশ, ফিরলেই ভাল। আমাদের আর কি ? যাই—চানের বেলা হয়ে গেল।

* * * *

কলিকাতার বাঈজীর বাড়ী। নাচগানের মহলা এই-মাত্র শেষ হইয়াছে। কক্ষমধ্যে মোসাহেবগণে ও ভক্তবৃন্দে পরিবেষ্টিত রতনবাঈজী। অদূরে মাথা নিচু করিয়া বসিয়া আছে অর্জ্জুন।

১ম ভক্ত ॥ মাইরি রতন, এক কথায় মার্ভেলাস্ !

২য় ভক্ত ॥ আমি কিন্তু ভাই হক্ কথা বলব। মুখচেয়ে কথা বলা আমার ধাতে নেই। না জমল নাচ—না জমল গান।

১ম ভক্ত ॥ মাইরি আরকি ! জমেনি মানে ?

২য় ভক্ত ॥ তুই ব্যাটা সঙ্গতের কি বুঝিস ? ঐ বোকচন্দ্রের তবলা অমন নাচগানটাকে স্রেফ্ মাটি ক'রে দিয়েছে ! মানে 'ট্রেন-কলিশন্' !

রতনবাঈ ॥ না না ওস্তাদ, ওদের কথা—ওদের কথা ধোরো না।

২য় ভক্ত ॥ ওদের কথা ধোরো না! ওহে, রতন আমাদের অবাক্ করলে!

এতক্ষণে ১ম ভক্ত নিজের ভুল বুঝিয়া ২য় ভক্তের সুরে বাজিয়া উঠিল

১ম ভক্ত ॥ তা নয় তো কি?

২য় ভক্ত ॥ তা থাকো—ঐ বেতাল তবলচি-নিয়েই থাকো। এই 'তালে'রা সটকে পড়ল এবার।

১ম ভক্ত ॥ যেখানে বেতাল, তাল সেখানে অচল।

রতন ॥ যাক্‌গে, তুমি এস ওস্তাদ। দেখি ওধারে কি হচ্ছে।

* * * *

নিভৃত কক্ষান্তরে জুয়ার আড্ডা পূর্ব্বোক্তরূপে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। পুলিস-অফিসার-বেশী শ্যামলাল যথাকর্ত্তব্য সমাধার পর অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া রঙ্গ করিতে লাগিল—

পুলিস-অফিসার ॥ এই, তুম্ কোন্ হ্যায়?

রতন ॥ বল, তুম্ হামারা খসম হ্যায়।

অর্জ্জুন ॥ হাম্—হাম্ খসম হ্যায়।

পুলিস-অফিসার ॥ ক্যায়সা খসম হ্যায়? ভাত-কাপড় দেতাহ্যায়?

অর্জ্জুন ॥ ভাত-কাপড় দেবার মুরোদ আমার নেই, আমি পালিয়ে এসেছি এর সঙ্গে।

পুলিস-অফিসার ॥ তুম্ বাঈজীকো নকর হ্যায়—উস্‌কো কুত্তা হ্যায়—বোলো—বোলো।

অর্জ্জুন ॥ হ্যাঁ হুজুর—হাম কুত্তা হ্যায়।

রতন॥ তুম্ মেরা জান্ হ্যায়। ই তুহারা দোস্ত্ হ্যায় শ্যামলাল।
(শ্যামলালের প্রতি) কেত্না মিলা আজ?

শ্যামলাল॥ গণো।

রতন॥ (গণিতে লাগিল) দশ—বিশ—চল্লিশ—পঞ্চাশ—শ'—

এই আবেষ্টনীর মধ্যে অর্জ্জুন দিনের পর দিন তাহার অধঃপতনের এক-একটি ধাপ করিয়া নিচে নামিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বের জড়তা ও দ্বিধাসংকোচ মন হইতে ক্রমেই মুছিয়া যাইতেছে। সয়তানের সহস্র বাহুর কবলে মনুষ্যত্বের এই আত্মসমর্পণে অর্জ্জুন কোন্ রসাতলের গর্ভে চলিয়াছে কে জানে!

*　　*　　*

মহাজন যুধিষ্ঠির সামন্তর গোলাবাড়ীর প্রাঙ্গণে লক্ষ্মণকে ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিল টিয়া—মহাজনের অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা। সে দেখিল, লক্ষ্মণ গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

টিয়া॥ ওমা, চুপ ক'রে ব'সে আছ! দাঁড়াও, বাবাকে ব'লে দিচ্ছি।

লক্ষ্মণ॥ বলোগে। সকাল থেকে এই খড়ই যে কেটেছি, তাই ঢের। ফ্যালো তু'টো কাঁচামিঠে আম—দাঁড়িয়ে দেখ কত খড় কাটি।

টিয়া॥ ওমা, বলে কি! কাঁচামিঠে আম আমি দেবো, না তুমি দেবে?

লক্ষ্মণ॥ পেটে কিছু না পড়লে পা চলে—না হাত ওঠে?

টিয়া॥ তাই বল (হাসিল)! শোন, মোয়া খাবে? আমায় খেতে দিয়েছে—আমি খাইনি। দূর্ ছাই, মিষ্টি আমি খেতে পারিনে। খেতে হয় তুমি খাও।

মোয়া বাহির করিল

লক্ষ্মণ ॥ দেখি দেখি! (কামড় দিয়া) বাঃ, বেশ তো!

টিয়া ॥ আরো আছে।

লক্ষ্মণ ॥ কৈ দেখি—দেখি!

টিয়া। (কোঁচড় হইতে কদমা বাহির করিয়া) এই যে।

লক্ষ্মণ ॥ (ছোঁ মারিয়া লইয়া) তুমি ভারী লক্ষ্মী মেয়ে, টিয়া।

টিয়া হাসিল

* * * *

আমগাছতলায় বালক-বালিকা। লক্ষ্মণ উঁচু ডালে উঠিল,—টিয়া নিচে আম কুড়াইতে লাগিল। বাহিরে মহাজনের কানে আম পড়ার শব্দ গিয়াছে। ওদিক হইতে শোনা গেল—"আম পাড়ছে কে রে?"
টিয়া দ্রুতপদে গাছের একটা নিচু ডালে গিয়া চড়িল। এমন সময় মহাজনের প্রবেশ।

মহাজন ॥ ও, তোমার এই কাজ—ধিঙ্গী মেয়ে?

টিয়া ॥ বাবা, বাবা, ঐ যে তোমার ঘরে গরু ঢুকল! হিসেবের খাতাপত্র সব চিবিয়ে খাবে!

মহাজন ॥ অ্যাঁ বলিস কি! খেলে—খেলে—সবাই মিলে আমায় খেলে!

দ্রুত চলিয়া গেল

টিয়া ॥ নেমে এস, শীগ্‌গির নেমো এস, বাবাকে সরিয়েছি।

* * * *

ওদিকে গণেশ মণ্ডল নিজ বাটীর উঠানে তাড়ি খাইয়া ঝিমাইতেছে। কুব্জা রুক্মিণী ভঙ্গী-সহকারে মুখ ছুটাইয়া চলিয়াছে—

রুক্মিণী ॥ বলি ভেবেছ কি তুমি? নিত্য নিত্য রস খেয়ে মাতলামো করবে?

গণেশ ॥ দেখ্‌ রাঙাবৌ, বেশী বকিস না আমাকে—তা হ'লে কিন্তু দোস্ত অর্জ্জুনের মত আমিও সহরে চলে যাব!

রুক্মিণী ॥ (ভঙ্গীর মাত্রা আরও বাড়াইয়া) অ্যাঁ, তুমি যাবে? কোথায় যাব গো! ইস্‌, মুরোদ! ঠাকুরপোর মত তেজ আছে নাকি তোমার? তুমি যাবে সহরে! থাক্‌ থাক্‌, আর শুনিয়ো না। তোমায় যত বীরত্ব এই ঘরের কোণে। কিন্তু শুনে রাখ, আর সইব না আমি!

এমন সময় দুর্গা সেখানে আসিল

রুক্মিণী ॥ ওমা! হঠাৎ গরীবের ঘরে হাতীর পা পড়্‌ল যে!

দুর্গা ॥ আমার বড় বিপদ, ভাই।

রুক্মিণী ॥ অর্জ্জুন ঠাকুরপো বোধহয় অনেক টাকা পাঠিয়েছে! রাখবার জায়গা পাচ্ছ না—এই তো?

গণেশ পূর্ব্ববৎ ঝিমাইতেছে। হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল—

গণেশ ॥ সে কি তোমার এই সিদ্ধিদাতা গণেশ? ওস্তাদ লোক, সহরে গেছে, 'তেরে-কেটে-তাক্‌'এর চোটে কলকাতার তাক্‌ লেগে যাবে—তখন শ'য়ে শ'য়ে পকেট ভরবে, আর আওয়াজ হবে—ঠন্‌-ঠন্‌-ঠন্‌—

দুই আঙ্গুলে টাকা বাজাইবার ভঙ্গী করিয়া দেখাইল

রুক্মিণী ॥ তাই তো তার বাচ্চা-ছেলেটা মহাজনের বাড়ীতে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে!

দুর্গা ॥ হ্যাঁ, এখুনি ফিরে আসবে ভাই—না খেয়ে। ঘরে আমার আজ চা'ল বাড়ন্ত।

গণেশ ॥ বেশ তো বৌঠান, নিয়ে যাও। আহা কচি ছেলেটা সারাদিন খেটে এসে উপোস ক'রে থাকবে! এই, দিয়ে দে—দিয়ে দে।

রুক্মিণী ॥ ইস্, দরদ কত! যেন গোলা গোলা ধান রয়েছে—চাইলেই পাওয়া যায়। ওর ছেলে উপোস ক'রে রয়েছে তো আমি কি করব? এমনি না পারে ভিক্ষে ক'রে খাওয়াক্। আবার বড়মুখ ক'রে বলা হয়—সোয়ামীকে রোজগার করতে পাঠিয়েছে!

দুর্গা একবার নিঃশব্দে রুক্মিণীর মুখের দিকে তাকাইয়া চলিয়া গেল।

ওমা, তেজ দেখে যে আর বাঁচিনে!

গণেশ ॥ কেন তেজ করবে না? ওর যখন দিন ছিল তখন ও কি কাউকে ফিরিয়েছে?

রুক্মিণী ॥ ওমা, আমিই কি ফিরিয়ে দিলুম? আমি কি বলেছি যে চা'ল দেব না? লক্ষ্মণ কি শুধু ওর ছেলে? কোন্ প্রাণে ঐ চামারটার বাড়ীতে ও কাজ করতে পাঠায় ঐ দুধের ছেলেটাকে?

আশ্চর্য্য এই নারীচরিত্র। রুক্মিণী সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল!

গণেশ ॥ রাঙাবৌ, তুই কাঁদছিস?

রুক্মিণী ॥ (গর্জ্জিয়া উঠিল) না।

*　　*　　*　　*

রুক্মিণীর নিক্ষিপ্ত প্রত্যেকটি শরই যে দুর্গার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়াছে, তাহার মুখ দেখিলেই তাহা বুঝিতে দেরী হয় না। দুর্গা শাক-পাতা সংগ্রহ করিয়া

বেড়াইতেছে। ইহা ছাড়া তাহার আর উপায়ই বা কি!
লক্ষ্মণের সম্মুখে একটা-কিছু ধরিয়া দিয়া তাহাকে
বুঝ দিতে হইবে তো!

* * * *

এদিকে দেখা গেল, ঐ মুখরা রুক্মিণী লক্ষ্মণের জন্য
নিজের বাড়া ভাত একথালা অন্নব্যঞ্জন আনিয়া তাহা
চাপা দিয়া রাখিয়া একা অর্জ্জুনের দাওয়ায় বসিয়া
আপন মনেই দুর্গার বাপান্ত করিতে করিতে মনের খেদ
মিটাইতেছে। এমন সময় পেটের ক্ষুধায় অস্থির হইয়া
লক্ষ্মণ বাড়ীতে ঢুকিল ও রুক্মিণীকে দেখিয়া বলিল—

লক্ষ্মণ॥ এ কি মাসী, তুমি! মা কৈ?

রুক্মিণী॥ ও-পাড়ায় কি কাজে গেল।

লক্ষ্মণ॥ বাঃ রে, আমার যে খিদে পেয়েছে।

রুক্মিণী এখন যেন অন্য মানুষ

রুক্মিণী॥ (হাসিয়া) সেইজন্যেই তো ব'সে আছি বাবা। তোর জন্যে
খাবার ঢাকা দিয়ে, আমাকে বসিয়ে রেখে গেছে তোর মা।

লক্ষ্মণ॥ (খুসী হইয়া) তাই বল!

রুক্মিণী ঢাকা তুলিয়া ও সযত্নে থালা সাজাইয়া
লক্ষ্মণকে খাইতে দিল। খাইতে বসিয়াই লক্ষ্মণ হাসি-
মুখে সানন্দে কহিল—

লক্ষ্মণ॥ দেখেছ মাসী, মা আজ রেঁধেছে কত! যেন নেমন্তন্ন!

রুক্মিণী॥ তা আর রাঁধবে না? তুই রোজগার করছিস, তোর বাবা
শ'য়ে শ'য়ে টাকা পাঠাচ্ছে! তোদের তো এখন পোয়াবারো!

অনুপস্থিত-দুর্গার উদ্দেশে কুটিল কটাক্ষ করিল

লক্ষ্মণ ॥ আমার বাবা কি যে-সে লোক ভেবেছ? বাবা কলকাতায় তবলা বাজায়!

রুক্মিণী ॥ হ্যাঁ রে, মাছের ঝোলটা কি আজ খুব ঝাল লাগছে?

লক্ষ্মণ ॥ নাঃ, খুব ভাল হয়েছে। আমার মায়ের মত কেউ ভাল রাঁধতে পারে না।

এমন সময় অঞ্চলমধ্যে একরাশ কলমিশাক লইয়া প্রবেশ করিল দুর্গা। প্রবেশপথেই সে লক্ষ্মণের কথা শুনিতে পাইয়া বলিল—

দুর্গা ॥ না, পারে না! এ কি!

প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হইলেও, পরমুহূর্তেই রুক্মিণী নিজেকে সামলাইয়া লইল।

রুক্মিণী ॥ নাও গো, এইবার তোমার ছেলেকে খাওয়াও। আমি সামনে থাকলে হয়তো আবার ছেলের খাওয়া হবে না।

দুর্গার প্রতি রোষকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল

লক্ষ্মণ ॥ মা, আজ খুব ভাল রেঁধেছ তো! এই দেখ, একটা ভাতও প'ড়ে নেই।

দুর্গা ॥ (বিস্মিত হইয়া) ভাত! কোথায় পেলি রে?

লক্ষ্মণ ॥ বা রে, তুমি ভাত ঢাকা দিয়ে রুক্মিণীমাসীকে বসিয়ে রেখে গেছ, আবার বলছ—ভাত কোথায় পেলি?

দুর্গা এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিল। দেখা গেল, তাহার চোখে জল ও মুখে হাসির রেখা।

দুর্গা ॥ লক্ষ্মণ, মহাজন তোর মাইনে দেবে কবে? দেখি, আজ একবার যেতে হবে।

*　　　*　　　*　　　*

যুধিষ্ঠির সামন্তর মহাজনী সেরেস্তা। খাতকগণের অকহতব্য ব্যবহারে তাহার মন ভারাক্রান্ত। এ মাসে আসল তো দূরের কথা—সুদ দিবার নামটিও কেহ করে নাই। সবাই ফাঁকি দিয়া পলাইয়া বেড়াইতেছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের পর দুর্য্যোধনের উদ্দেশে বলিয়া উঠিল—

মহাজন ॥ বুঝলে দুর্য্যোধন, এ দুনিয়ায় কোন শালার ভাল করতে নেই।

প্রত্যুত্তরে দুর্য্যোধন কি একটা বলিবার উদ্যোগ করিতেই, মহাজন বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল—

মহাজন ॥ ওরা আবার কা'রা আসছে?

দুর্য্যোধন ॥ বোধ হচ্ছে, লক্ষ্মণের মা লক্ষ্মণের মাইনে নিতে আসছেন।

মহাজন দুর্য্যোধনের প্রতি একটা চোখের ইসারা করিয়া পত্রপাঠ উহাদিগকে বিদায় করিবার পরামর্শ দিল।

অবগুণ্ঠিতা দুর্গা ও লক্ষ্মণ আসিল

মহাজন ॥ আরে, এস এস—লক্ষ্মণ এস। কিন্তু তোমার মা এসেছেন কেন বাবাজী?

লক্ষ্মণ ॥ আমার মাইনে নিতে এসেছেন।

মহাজন ॥ তা বটেই তো। লক্ষ্মণের ক'মাস কাজ হ'ল দুর্য্যোধন?

দুর্যোধন ॥ আজ্ঞে, এই পরশু তিন মাস পূর্ণ হ'ল।

মহাজন ॥ (যেন কিছুই জানে না এইভাবে) তিন মাসের ওর মাইনে দাওনি!

দুর্যোধন ॥ সে কি, মাইনে দেব না কেন? মাইনে মাসান্তে সঙ্গে-সঙ্গেই চুকিয়ে দিয়েছি। তবে হ্যাঁ, ওদের হাতে দেইনি, হিসেবে দিয়েছি।

মহাজন ॥ ওদের হিসেবে মানে?

দুর্যোধন ॥ অর্জ্জুনের ধানের দরুন আমাদের সেই পাওনা টাকাটা—সেই হিসেবে মাসে মাসে সুদ বাবদ ওয়াশিল দিয়ে যাচ্ছি।

মহাজন ॥ নাঃ, অর্জ্জুন যে এমন ফাঁকি দিয়ে পালাবে তা কোনদিন ভাবিনি।

দুর্গা ॥ তিন মাসের মাইনেতেও কি দেনা শোধ হয় নি?

মহাজন ॥ হিসেবটা দেখিয়ে দাও তো দুর্যোধন।

দুর্যোধন ॥ হিসেবের কি বুঝবে ওরা?

কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে
কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্জে—

বলি বুঝলে কিছু?···তবে?

মহাজন ॥ তবু একটু বুঝিয়ে দাও।

দুর্যোধন ॥ মাইনে হচ্ছে মাসে তিন টাকা। আমাদের পাওনা—আসল, আসলের সুদ, তস্য সুদ এসব নিয়ে হচ্ছে তিনশ' টাকা। মানে দেনা এ জন্মে শোধ হবার কোন রাস্তা দেখছি না।

দুর্গা ॥ তা ঠিক। আপনাদের ঋণ জন্ম-জন্মান্তরেও শোধ করতে যখন পারব না, তখন আমার লক্ষ্মণকে এ হাড়ভাঙা খাটুনি আর আমি খাটতে দেব না। লক্ষ্মণ, বাড়ী চল বাবা!

তাহারা বাহির হইয়া পথ চলিতে লাগিল। হঠাৎ লক্ষ্মণ মাকে কহিল—

লক্ষ্মণ ॥ না মা, আমি ফিরে যাই।

দুর্গা ॥ ফিরে যাবি! কেন বাবা?

লক্ষ্মণ ॥ বাবা তো এখনো টাকা পাঠাননি। টাকা এলে কাজ ছেড়ে দিয়ে আসব। তবু তো এক বেলা ক'রে খেতে পাই মা—

দুর্গা ॥ আমি যখন একবার 'না' ব'লে এসেছি, ও-কাজে তোমার আর যাওয়া হবে না।

লক্ষ্মণ ॥ বাবা টাকা পাঠাচ্ছে না, চলবে কি ক'রে মা?

দুর্গা ॥ আমি বলছি, টাকা তিনি পাঠাবেন।

*　　　*　　　*　　　*

পরদিন দুর্গা একাকিনী এক স্বর্ণকারের দোকানে আসিয়া দাঁড়াইয়া অঞ্চলমধ্য হইতে বাহির করিল ন্যাকড়ায় বাঁধা একটি ছোট্ট পুঁটুলি। কর্ম্মব্যস্ত দোকানী তাহার চোখের এক জোড়া ভাঁটার মত চশমার উপর দিয়া দুর্গাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল। তাহার ভাগ্যে আজ যে বেশ একটু বড় রকম লাভের যোগাযোগ ইহা ঐ পাকা লোকের বুঝিতে আর বাকী রহিল না। একে স্ত্রীলোক, তাহার উপর আবার সে আসিয়াছে সম্পূর্ণ একা।

যথারীতি হস্তকৌশল-সহকারে ওজন-পর্ব্বাদি সারিয়া দুর্গাকে লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণকার কহিল—

স্বর্ণকার ॥ (কাগজে কলমে হিসাব করিতে করিতে) তা হ'লে তোমার হ'ল গিয়ে একভরি পাঁচ রতি। তার দাম হ'ল গিয়ে একশ'

ছু'টাকা—আর হ'ল গিয়ে—আচ্ছা, নাও, পূরো একশ' পাঁচ টাকাই নাও।

দুর্গা নীরবে মূল্যগ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল।

স্বর্ণকার॥ (সহকারীর প্রতি) সোনাটা চটপট্ গালিয়ে ফ্যালো হে, আবার একটা ফ্যাসাদ বাধতে পারে।

*   *   *

গ্রাম্য ডাকঘরের বারান্দায় গাদাগাদি ভীড়ের মধ্যে বসিয়া এক বৃদ্ধ মনিঅর্ডার-লেখক নিজকর্ম্মে রত। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম্য নিরক্ষর লোকের এই ধরনের কাজের একমাত্র নির্ভর উক্ত ব্যক্তির অনুগ্রহ। কিন্তু এই অনুগ্রহ করিতে যাওয়ারও যে কি ঝকমারি, তাহা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন ঐ লেখকটি।

লেখক॥ কত টাকা?

প্রেরক॥ পাঁচ সিকে।

লেখক॥ কে পাবে?

প্রেরক॥ যজ্ঞেশ্বর মোহান্তি!

লেখক॥ কি বললে? বানান ক'রে বল বাপু।

প্রেরক॥ বানানই যদি করতে পারব, তবে পয়সা খরচ ক'রে আপনাকে দিয়ে লেখাব কেন মশাই?

লেখক॥ উঃ! গ্রামের নাম?

প্রেরক॥ বজ্রডম্বুরা।

লেখক॥ ওরেঃ বাবা!······পোস্ট অফিস?

প্রেরক॥ ত্র্যম্বকেশ্বর।

লেখক ॥ এই সেরেছে !···কে পাঠাচ্ছে ?

প্রেরক ॥ পুণ্ডরীকাক্ষ কুণ্ডু ।

লেখকমহাশয়ের ধৈর্য্য এবার সীমা অতিক্রম করিল

লেখক ॥ (ভঙ্গী করিয়া) পুণ্ডরীকাক্ষ কুণ্ডু । হবে না বাপু, এ চার পয়সার কম্ম নয় ।

প্রেরক ॥ তা বেশ, দু'আনাই নেবেন—আপনি লিখুন ।

লেখক ॥ নামটা আবার বল ।

প্রেরক ॥ পুণ্ডরীকাক্ষ কুণ্ডু ।

লেখক ॥ পুন্-ড-রি-কা-খ্—এইঃ যা, নিবের দফা গয়া !

প্রেরক ॥ কিন্তু কুপন যে এখনও লেখা হল না ?

লেখক ॥ আর হবেও না । এই পাঠাতে হয় পাঠাও, নয়তো আর কাউকে দিয়ে লেখাও । যত্তসব—উঃ !

প্রেরক ॥ কা'কে আবার পাই ?

ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিল

হঠাৎ লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল দুর্গা ! সেও ঐখানে দাঁড়াইয়া ছিল ; সম্মুখে আসিয়া কহিল—

দুর্গা ॥ আমারটা লিখে দি'ন-না ।

লেখক ॥ (লিখিতে আরম্ভ করিয়া) কত টাকা ?

দুর্গা ॥ একশ' ।

লেখক ॥ কে পাবে ?

দুর্গা ॥ দুর্গামণি দাসী ।

লেখক ॥ এইবার ঠিকানা—কা'র বাড়ী ?

দুর্গা ॥ লিখুন—লক্ষ্মণ মণ্ডলের বাড়ী ।

লেখক॥ নাঃ, আজ দেখছি দিনটাই খারাপ। কোন পাড়া?

দুর্গা॥ উত্তর পাড়া।

লেখক॥ গ্রামের নাম?

দুর্গা॥ কল্যাণপুর।

লেখক॥ পোস্ট আফিস?

দুর্গা॥ শ্যামনগর।

লেখক॥ কে পাঠাচ্ছে?

দুর্গা॥ (বিচলিত হইয়া) লিখুন—অর্জ্জুন মণ্ডল।

লেখক॥ কুপনে কি লিখবে?

দুর্গা॥ আপনি লিখে দিন।

লেখক॥ লিখব তো আমি, কিন্তু কি লিখব—বল না?

দুর্গা॥ সে অনেক কথা। আপনাকে শুনতে হবে—আপনাকে লিখে দিতে হবে—আপনার পায়ে পড়ি।

লেখক॥ সে কি মা? ব্যাপার কি? আচ্ছা বল।

দুর্গা বলিয়া যাইতে লাগিল—

* * *

কল্যাণপুরে সপ্তাহে মাত্র একদিন শ্যামনগর ডাকঘর হইতে পিওন আসিবার নিয়ম। ঐ দিন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গ্রামের লোকেরা তাহার প্রতীক্ষা করে, বিশেষ দরকার না হইলে পিওনের প্রতি বাড়ীতে যাওয়ারও বড় একটা দরকার হয় না। আর বিশেষতঃ গ্রামটিও চাষী-প্রধান বলিয়া গ্রামবাসীর নিত্য চিঠি-পত্র লিখিবার ও পাইবার সম্ভাবনাও খুবই কম থাকে। কিন্তু আজ গ্রামের বনমালী বিশেষ একটা চিঠির

প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে—কখন পিওন আসিবে। আজ এক মাস হইল তাহার 'ইস্ত্রী' সেই যে তাহার ভাইএর বাড়ী গিয়াছে, আর তাহার পৌঁছ-খবর দিবার নামটিও নাই। সেই চিঠি পড়িয়া শুনাইবার লোকও তাহার এখানেই মজুত।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল পিওন আসিতেছে। বনমালী অগ্রসর হইল সকলের আগে।

জনৈক গ্রামবাসী ॥ আমার চিঠি আছে?

পিওন ॥ না।

বনমালী ॥ আমার?

পিওন ॥ কি নাম?

বনমালী ॥ শ্রীবনমালী—

পিওন ॥ না।

বনমালী হতাশ হইয়া পড়িল

বনমালী ॥ আজও এল না চিঠি! এত ক'রে ব'লে দিলুম—বাপের বাড়ী পৌঁছেই চিঠি দেবে—

পিওন ॥ আচ্ছা, এ গাঁয়ে দুর্গামণি দাসী কে—লক্ষ্মণ মণ্ডলের বাড়ী?

বনমালী ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ আছে। কেন বল তো ভাই?

পিওন ॥ টাকা এসেছে।

বনমালী ॥ টাকা! টাকা কে পাঠিয়েছে?

পিওন ॥ অর্জ্জুন মণ্ডল।

বনমালী ॥ কত টাকা?

পিওন ॥ একশ' টাকা।

বনমালী ॥ একশ' টাকা অর্জ্জুন মণ্ডল পাঠিয়েছে? আমি এক্ষুনি গিয়ে

খবর দিচ্ছি। তুমি চ'লে এস—গণেশ দাসের পাশের বাড়ী। ঐ দেখা যাচ্ছে।

নিজের সকল দুঃখ ভুলিয়া অর্জ্জুনের বাড়ীর দিকে ছুটিল। সম্মুখে যাহার সহিত দেখা হইল, এই সংবাদ প্রচার করিতে লাগিল বনমালী।

বনমালী ॥ গণেশভাই, ও গণেশভাই—আরে অর্জ্জুন সত্যি-সত্যিই বৌকে টাকা পাঠিয়েছে!

গণেশ ॥ (বাহিরে আসিয়া) কি? কি হয়েছে?

বনমালী ॥ অর্জ্জুন বৌকে টাকা পাঠিয়েছে! বাবা, একশ' টাকা!

গণেশ ॥ (আশ্চর্য্য হইয়া) তাই নাকি! বল কি হে?

বনমালী ॥ পেত্যয় না হয় তো জিজ্ঞেস কর, এই তো পিওন সাহেব দাঁড়িয়ে।

সকলে অর্জ্জুনের বাড়ীর সম্মুখে আসিলে গণেশ লক্ষ্মণকে ডাকিতে লাগিল—

লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! আরে তোর বাবা তোর মাকে একশ' টাকা পাঠিয়েছে। এই যে পিওন এসেছে—তোর মাকে ডাক্ শীগগির।

লক্ষ্মণ বাহিরে আসিয়াছিল, পুনরায় ভিতরে মাকে খবর দিতে ছুটিল—

লক্ষ্মণ ॥ মা, মা! বাবা টাকা পাঠিয়েছে।

দুর্গা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল

গণেশ ॥ আরে বাবা, দোস্ত যে টাকা পাঠাবে তা আমি আগেই গাঁসুদ্ধ লোককে ব'লে রেখেছি!

পিওন ॥ তোমারই নাম দুর্গামণি দাসী?

গণেশ॥ হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

পিওন॥ ঠিক জান ?

গণেশ॥ বা রে! পাশের বাড়ীতে থাকি, আর আমি জানব না ? এখনও 'সে' পেটে পড়েনি বাবা যে ভুল হবে।

পিওন॥ তোমার নাম ?

গণেশ॥ হেঁ-হেঁ—শ্রীগণেশচন্দ্র দাস।

পিওন॥ তোমায় সাক্ষী হ'তে হবে।

গণেশ॥ আলবাত্ হব!

পিওন॥ লিখতে পার ?

গণেশ॥ লেখা ? না পিওন বাবা, ওসব অভ্যেস নেই—আসে না। তা শিখছি একটু একটু—ঐ রাঙাবৌএর কাছে।

পিওন॥ হুঁ। তা হ'লে দেখি—আঙুল দেখি ? উহুঁঃ, বুড়ো আঙুল।

গণেশের টিপসহি লওয়ার পর দুর্গার উদ্দেশে

দুর্গামণি দাসী, তোমার টিপসই লাগবে এইখানে।—এ-ই—হুঁ।

দুর্গার হাতে টাকা দিল

গণেশ॥ কোথায় আছে ? কেমন আছে ? ও রাঙাবৌ, একবার এস-না এদিকে।

পিওন কুপন ছিঁড়িয়া গণেশের হাতে দিল। রুক্মিণী আসিয়া গণেশের হাত হইতে উহা লইয়া পড়িতে সুরু করিল। তাহার এই পড়ার ধরণ দেখিয়া বুঝা গেল—তাহার বিদ্যার দৌড় খুব বেশীদূর নয়।

রুক্মিণী॥ (পড়িতে লাগিল) আমার দুর্গামণি (এইখানে রুক্মিণীর ভ্রূ কুঞ্চিত), মেলায় মেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। তাই সময়মত টাকা

পাঠাইতে পারি নাই। আজ একশত টাকা পাঠাইলাম। তোমার জন্য মনটা বড়ই হুহু করে (মুখের একটা ঝাঁকি)। আমার লক্ষ্মণ ভাল আছে তো? কলিকাতায় ফিরিয়া বাসা করিতে পারিলেই তোমাদের লইয়া আসিব। আমার খুব নাম হইয়াছে, বেতন বাড়িবে। তুমি আমার ভালবাসা জানিবে। —তোমারই অর্জ্জুন

শেষ কথাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুক্মিণী দুর্গার পানে কটাক্ষ হানিয়া পুনরায় মুখনাড়া দিল।

গণেশ ॥ তবে চল্লুম রাঙাবৌ—

রুক্মিণী ॥ কোথায় গো?

গণেশ ॥ দোস্তর কলকাতার বাসায়! টাক্ ডুমাডুম ডুম্—

নাচিতে নাচিতে প্রস্থান করিল

রুক্মিণী ॥ আমাদের ভাই আজ মিষ্টিমুখ করাতে হবে।

দুর্গা ॥ আঁ্যা—তা খাবে বৈকি? লক্ষ্মণ, যা তো বাবা, মিষ্টি কিনে আন্। (উপস্থিত বালকবালিকাগণকে) সন্ধ্যে গড়ালে তোমরা সব এস।

লক্ষ্মণ ॥ আয় সব!

বালকবালিকাগণ ॥ মিষ্টি খাব রে—সন্ধ্যেবেলায় মিষ্টি খাব রে।

লক্ষ্মণ ও বালকবালিকারা চলিয়া গেল

রুক্মিণী ॥ সত্যি, মানুষকে চিনতে যে কত ভুল হয়, আজ তা বুঝেছি। তুই ভাই আমাকে মাফ কর্।

দুর্গা ॥ সন্ধ্যেবেলা এস—কেমন?

রুক্মিণী ॥ আচ্ছা লো আচ্ছা—আনন্দ যে আর ধরে না দেখছি!

রুক্মিণী প্রস্থান করিলে পরক্ষণে প্রবেশ করিল লক্ষ্মণ সহ মহাজন ও তাহার গোমস্তা।

মহাজন ॥ শুনে আমিও খুব খুসী হয়েছি লক্ষ্মণের মা। অর্জ্জুন যে এমনি একটা বড় কিছু করবে, তা আমি জানতাম। শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। এ কি শুধু তোমার একলার মাথা উঁচু হয়েছে—আজ আমাদের এই গোটা গাঁটা উজ্জ্বল হয়ে গেল। কি বল দুর্য্যোধন ?

মহাজন ইসারা করিল

দুর্য্যোধন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই! তা লক্ষ্মণের মা, কথায় বলে, শত্রুর শেষ আর ঋণের শেষ রাখতে নেই। তাই বলছিলাম কি, হাতে যখন টাকা এসে পৌঁছেচে তখন অন্ততঃ আমাদের পাওনা সুদটা শোধ ক'রে দাও।

মহাজন ॥ দুর্য্যোধন, হিসেবটা বার কর তো।

দুর্য্যোধন দপ্তর বাহির করিয়া হিসাব দেখাইতে যাইতেছিল, দুর্গা তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—

দুর্গা ॥ থাক্, কত টাকা—তাই বলুন।

দুর্য্যোধন ॥ কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে—
তা শ'খানেক টাকা হ'লে হালের সুদটা মিটে যায়।

দুর্গা ॥ লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ ॥ মা!

দুর্গা ॥ তোমার হাতের টাকাও দিয়ে দাও।

লক্ষ্মণ ॥ দিয়ে দেব ?

দুর্গা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ!

লক্ষ্মণের হাত হইতে টাকা কাড়িয়া লইয়া—সবগুলি মহাজনের সম্মুখে ছুঁড়িয়া দিল। দুর্য্যোধন বিনা-বাক্যব্যয়ে ঐগুলি কুড়াইতে লাগিল। দুর্গা কহিল—

দুর্গা ॥ ওগো, শুধু একটা নোট আমায় ভিক্ষে দাও। আজ একমাস গরুগুলোকে পেটভ'রে খাওয়াতে পারিনি। যেমন ক'রে পারি তোমাদের সব দেনা শোধ করব—আজ শুধু একটা নোট ভিক্ষে চাইছি।

দুর্গার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে অব্যক্ত যন্ত্রণায় হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

* * * *

এদিকে অর্জ্জুন এখন বাঈজীর হাতের ক্রীড়াকন্দুক মাত্র। এতদিনে বাঈজী বহু আয়াসে তাহাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়াছে। গত জীবনের সুখ-দুঃখের অনেক কথা আজও মনে পড়ে, কিন্তু তাহার সেই অনুভূতির গভীরতা নাই। সমাজ, সংসার, দুর্গা ও লক্ষ্মণের স্মৃতি—কোন-কিছুই মনে আর গভীর রেখাপাত করে না। তাহার অতীত অস্পষ্ট, বর্ত্তমান খরস্রোতে ভাসিয়া-যাওয়া তৃণগুচ্ছের মত, আর ভবিষ্যৎ নিকষ-কালো যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য। বাঈজীর গুপ্ত ব্যবসায়ের রঙ্গমঞ্চে এখন অর্জ্জুন একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় সুদক্ষ অভিনেতা।

আজও বাঈজীর নিভৃত কক্ষে জুয়ার আড্ডা বসিয়াছে, কিন্তু অর্জ্জুন আজ এখানে অনুপস্থিত—কক্ষান্তর হইতে তাহার তবলার ধ্বনি শোনা যাইতেছিল। বাঈজী নিজে জানালায় দাঁড়াইয়া পুলিসের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে। পুলিস দেখিতে পাইয়াই সে নির্দ্দেশ দিতেই জুয়াড়িরা সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইল। এখন রতন কক্ষমধ্যে একা—মুখে মৃদু হাসি। বন্ধ দরজায় পুলিসের পুনঃ পুনঃ করাঘাত হইতেছে। অর্জ্জুন

ছুটিয়া আসিয়া পুলিসকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতে গিয়াই একেবারে অবাক্ হইয়া গেল—আজ আবার তাহাদের এ কি মূর্ত্তি !

অর্জ্জুন ॥ (জনৈক পুলিসের প্রতি) বা রে দোস্ত, আজ আবার এ কি বেশ ! গোঁফ নেই কেন ?

পুলিসটি তাহার ভুঁড়িতে একটা ঘা মারিল। পরপর আরও কয়েকজন পুলিস ভিতরে প্রবেশ করিল ; তাহারা দ্রুত হস্তে অর্জ্জুনের হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিল।

অর্জ্জুন ॥ বা রে ! এ কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

পুলিসের দল সারা ঘর অনুসন্ধান করিতে লাগিল

জনৈক পুলিস ॥ টেবিল ফাঁকা, শালালোগ্ সব ভাগ্ গিয়া—

দ্বিতীয় পুলিস ॥ কাঁহা ভাগেগা। হিঁয়াই হ্যায়। এই শালা, দেখাও।

অর্জ্জুনকে রুলের গুঁতা মারিতে লাগিল। এইবার সে বুঝিল, ইহা তাহার সর্পে রজ্জুভ্রম--পালে এবার সত্য-সত্যই বাঘ পড়িয়াছে।

* * * *

জেল-হাজতের মধ্যে বসিয়া নিজ অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে অর্জ্জুন। যাহা-কিছু সে করিত, বাঈজীর অঙ্গুলি হেলনে তাহার হুকুম তামিল করিত—এইমাত্র। কারণ স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছুই তাহার অবশিষ্ট ছিল না। আর যে অপরাধে তাহার আজ এখানে আগমন তাহাতে পরোক্ষভাবে জড়িত থাকিলেও প্রত্যক্ষ রঙ্গভূমি হইতে সে তো দূরেই ছিল। কিন্তু সত্যই যাহারা ছিল রঙ্গমঞ্চে, লুটের মাল সহ তাহারা

সকলেই নিরাপদে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। তাহার জন্ম নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বনিম্ন বখরাটাও সে পাইল না, আবার তাহারই ভাগ্যে ঘটিল এই শোচনীয় বিড়ম্বনা। সহসা তাহার চিন্তার গতি মোড় ফিরিল। মনে পড়িয়া গেল তাহার গরুকয়টির কথা, খেত-খামারের কথা, আর মহাজন ও জমিদারের তাগাদা, সঙ্গে সঙ্গে দুর্গার কথা। না-জানি মহাজন কি লাঞ্ছনাই করিতেছে দুর্গার আর লক্ষ্মণের। কি করিয়া সংসার চলিতেছে? কেমন করিয়া সব তাল সামাল দিতেছে দুর্গা? ঘর-সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় মনে হইয়া বুকে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। আবার হঠাৎ তাহার মনে হইল, রতন নিশ্চয়ই তাহাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে—টাকার অসাধ্য কি আছে? তাহা না করিয়া সে পারে না—এই দীর্ঘকালেও সে কি রতনকে চিনিতে পারে নাই? কাল বিচারের সময় আদালতে হাজির হইয়াই সে দেখিতে পাইবে, রতন ব্যাকুল হইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে—উকিল-মোক্তার সহ। এইরূপ অসংলগ্ন কত চিন্তাই যে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল, তাহার বুঝি আর শেষ নাই।

* * * *

প্রকাশ্য আদালতে পরদিন আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান অর্জ্জুনের সেইসকল আশাভরসার আকাশ-কুসুম আকাশেই মিলাইয়া গেল—যখন বাঈজী নিজে তাহারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া একমাত্র তাহাকেই অপরাধী প্রমাণ করিল।

বিচারক ॥ আসামী অর্জ্জুন মণ্ডল, বাঈজী রতনবাঈ ও অন্যান্যের সাক্ষ্যে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জুয়ার আড্ডাটি ছিল তোমার। পুলিস সেজে জুয়াড়িদের ধাপ্পা দিয়েও তুমি পয়সা কামাই করতে। সমাজের বুকে এই দুর্নীতি একটা দুষ্টক্ষত। আইন-মোতাবেক আমি তোমার এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলাম।

দুইজন প্রহরী অর্জ্জুনকে কাঠগড়া হইতে নামাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

* * * *

অর্জ্জুনের জীবননাট্যের একটি অঙ্ক সেইদিন শেষ হইল—যেদিন অর্জ্জুনের বাড়ীর সম্মুখে আদালতের পিওন সহ দুর্য্যোধন অর্জ্জুনের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তিতে দেনার দায়ে ডিক্রিজারী করিতে আসিয়াছে। ঢোলসহরৎ শুনিয়া কৌতূহলী গ্রামবাসিগণ ছুটিয়া আসিল ও সবিস্ময়ে শুনিতে লাগিল আদালতের পিওনের সুস্পষ্ট ঘোষণা—

আদালতের পিওন ॥ (হাঁকিতে লাগিল) অর্জ্জুন মণ্ডলের দেনার ডিক্রিজারী দিয়ে যুধিষ্ঠির মহাজন অর্জ্জুন মণ্ডলের হাল-বলদ ও বাড়ীতে খাসদখল পেলেন।

পুনরায় ঢোলসহরৎ চলিতে লাগিল। দুর্গা ও লক্ষ্মণ বাহিরে আসিল—দুর্গার হাতে একটি ছোট পুঁটুলি। দুর্য্যোধনের শ্যেনদৃষ্টি পড়িল উহারই উপর। তাহার আদেশে পুঁটুলিটি খোলা হইলে দেখা গেল—উহাতে অর্জ্জুনের সেই খড়মজোড়া।

দুর্য্যোধন ॥ আচ্ছা আচ্ছা, এ নিয়ে যাও।

বাড়ীর বাহির হইয়া দুর্গা ও লক্ষ্মণ পথ চলিতে লাগিল। কয়েকজন প্রতিবেশী তাহাদের অনুসরণ করিল।

১ম প্রতিবেশী। কোথায় যাবে লক্ষ্মণের মা, এই অবেলায় ?

২য় ॥ আজকের দিনটা থেকে যাও।

৩য় ॥ মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে নাও—কি করবে-না-করবে।

১ম ॥ আজ যদি অর্জ্জুন থাকত তা হ'লে কি আর—

২য় ॥ লক্ষ্মণের মা !

দুর্গা নীরব। সকলে অগ্রসর হইতে লাগিল। হঠাৎ নেপথ্য হইতে মহাজনের কন্যা টিয়ার গলার স্বর শোনা গেল—"লক্ষ্মণদা ! লক্ষ্মণদা !"

টিয়া লক্ষ্মণের সম্মুখে আসিয়া কহিল—

টিয়া ॥ তোমরা চ'লে যাচ্ছ ?

লক্ষ্মণ ॥ হ্যাঁ টিয়া, আমরা কলকাতা যাচ্ছি—কলকাতা।

টিয়া ॥ কেন ?

লক্ষ্মণ ॥ বাবার কাছে।

টিয়া ॥ তোমরা—তোমরা আর গাঁয়ে আসবে না ?

দুর্গা ॥ আসব মা। ভগবান যদি মুখ তুলে চান—আসব বৈকি।

দুর্গা ও লক্ষ্মণ তাহাদের গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল। টিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

* * * *

কলিকাতায় দুর্গা ও লক্ষ্মণের একটা আশ্রয় মিলিয়াছে। গৃহকর্ত্রী মাতঙ্গিনী দেবী পাকা লোক। এই মাগ্‌গির বাজারে দুই-দুইটি লোকের পেট চালানো তো বড়

যে-সে কথা নয়। তাই তিনি প্রথমেই কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া লইয়াছেন—বিনা বেতনে তাহারা কাজ করিবে আর সেই কাজেরও কোন শ্রেণীবিভাগ থাকিবে না। যদিও সে রাঁধুনী তথাপি দরকার হইলে সব রকম কাজই দুইজনে করিবে।

এই বাটীর একটি কক্ষে দেখা যাইতেছে, গৃহকর্ত্রীর ছোট ছেলে ভুলো পাঠাভ্যাসে রত। লক্ষ্মণ ঘর পরিষ্কার করিতেছে।

ভুলো ॥ (দুলিয়া দুলিয়া পড়িতেছে)

তিন একে তিন
তিন দু'গুণে ছয়
তিন তিরিক্কে নয়
তিন চারে দশ

লক্ষ্মণ ॥ তিন চারে কথনো দশ হয়? বারো—বারো।

ভুলো ॥ তিন চারে বারো? তুই তো বড় জানিস! তিন চারে বারো!

লক্ষ্মণ ॥ বা রে, তিন চারে কথনো দশ হয়! হাঃ হাঃ হাঃ।

কক্ষে প্রবেশ করিলেন স্বয়ং মাতঙ্গিনী দেবী

মাতঙ্গিনী ॥ ঘরঝাঁট না দিয়ে এত হাসাহাসি হচ্ছে যে?

ভুলো ॥ দেখতো মা,'তিন চারে আমি বলছি দশ—ও বলছে বারো।

মাতঙ্গিনী ॥ বলি দশ হোক, বারো হোক—তুই ভুল ধরবার কে র‍্যা?

গোলমাল শুনিয়া দুর্গা সেখানে আসিল। মাতঙ্গিনী বলিলেন—

এই যে লক্ষ্মণের মা, তোমার এই পণ্ডিত ছেলে দিয়ে আমার ঘরঝাঁট দেওয়া, বাসনমাজা চলবে না বাপু! তুমি রাঁধুনী—তুমি যদি চণ্ডী-পাঠ করতে যাও তবে তো বাছা এ বাড়ীতে থাকা চলবে না। কথাটা

তোমার ছেলেকেও ভাল ক'রে সমঝে' দিয়ো। রান্না ছেড়ে উঠে এসেছ, ওদিকে গেল—সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

দুর্গা॥ কেন, কি হ'ল মা?

মাতঙ্গিনী॥ এই লক্ষ্মণ, তোকে না বাজারে যেতে বলেছিলাম দু' পয়সার গরমমশলা আনতে? এনেছিস?

লক্ষ্মণ॥ আমার বাজার-যেতে ভয় করে কর্ত্তামা—যদি হারিয়ে যাই!

মাতঙ্গিনী॥ ন্যাকা আমার! হারিয়ে যাবেন! কেবল কাজে ফাঁকি দেবার মতলব!

দুর্গা॥ ছেলেমানুষ, পথ চেনে না, ভয় পায়। গরমমশলা আমিই নিয়ে আসছি মা।

মাতঙ্গিনী॥ তুমি গেলে মিছিমিছি কয়লাগুলো পুড়বে না? খালি খরচ বাড়াবার মতলব! এই দেখ, রান্না ছেড়ে উঠে এসেছ! এমন করলে বাপু তোমাদের রাখা চলবে না।

*　　*　　*　　*

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার মাসকয়েক পরে একদিন সকালে আলিপুর জেল হইতে বাহির হইল অর্জ্জুন। কিন্তু দেখিয়া তাহাকে চেনা কঠিন—এমনি চেহারা হইয়াছে। দেখা গেল, সে দ্রুতপদে চলিয়াছে শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে। শিয়ালদহ পৌঁছিয়া সে টিকিট করিয়া ট্রেনে চড়িল।

*　　*　　*　　*

বাড়ীতে পা দিয়াই অর্জ্জুন স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কি! ইহারা সব ঘরে তালাবন্ধ করিয়া কোথায় গেল? আর বাড়ীঘরেরও এমন ভগ্নদশা কেন? সে ডাকিতে লাগিল—

অর্জ্জুন ॥ লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ !

সারা উঠানে আগাছা জন্মিয়াছে ! কিন্তু দুর্গাকে তো তাহার চিনিতে বাকী নাই, কত যত্নেই সে কুটিরখানি সাজাইয়া রাখিত ! নিজের অগোছাল স্বভাবের জন্য কতদিন সে দুর্গার কাছে বকুনি খাইয়াছে। গোয়ালঘরের দিকে ছুটিয়া গিয়া আরও অবাক হইল। ব্যাপার কি ? অর্জ্জুন ছুটিল গণেশের বাড়ীর দিকে।

অর্জ্জুন ॥ গণেশ ! গণেশ বাড়ী আছ ?

ঘরের বাহিরে আসিল রুক্মিণী। বিস্মিত হইয়া কহিল—

রুক্মিণী ॥ এ কি ? ঠাকুরপো না ?

অর্জ্জুন ॥ হ্যাঁ আমি। দুর্গা, লক্ষ্মণ—এরা সব কোথায় ? বাড়ীতে তালা দেওয়া কেন ?

রুক্মিণী ॥ তারা তো তোমার কাছে যাবে ব'লে কলকাতায় গেছে।

অর্জ্জুন ॥ কবে ?

রুক্মিণী ॥ গেল-পূজোর আগে। তুমি যে টাকা পাঠিয়েছিলে তা পেয়েই—

অর্জ্জুন ॥ টাকা পাঠিয়েছি ! আমি ! কা'কে ?

রুক্মিণী ॥ কেন, দুর্গাকে—একশ' টাকা মনিঅর্ডার ক'রে।

অর্জ্জুন ॥ তুমি বলছ কি ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না ! গণেশ কৈ ?

রুক্মিণী ॥ সদরে গেছে। তুমি বস—আমি বলছি। মহাজন যেদিন

ঘরে তালা দিল, সেই থেকে ভিটে অন্ধকার। সাঁজের বাতিও আর জ্বলে না। এ কি, উঠছ যে?

অর্জ্জুন ॥ চলি।

রুক্মিণী ॥ সে কি? কোথায়?

অর্জ্জুন ॥ জানি না বৌদি। মহাজন বাড়ী আছে?

রুক্মিণী ॥ তা হয়তো আছে। কিন্তু তুমি তো না খেয়ে যেতে পারবে না ঠাকুরপো।

অর্জ্জুন ॥ তুমি খেতে বললে—তাতেই আমার খাওয়া হ'ল। জান বৌদি—আজ একটি বছর এই কথাটি আমি কারও মুখে শুনিনি।

রুক্মিণী ॥ সত্যি, সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। তুমি একটু বস, দু'খানা বাতাসা দিয়ে একটু জল খেয়ে যাও। তুমি এমন ক'রে চ'লে গেলে আমার বুকে সেটা কাঁটার মত বিঁধতে থাকবে।

* * *

মহাজন যুধিষ্ঠির সামন্তর মেজাজটি আজ বেশ একটু খুসী। সেরেস্তায় বসিয়া সে মনের আনন্দে গুনগুন স্বরে গান গাহিতেছে।

মহাজন ॥ মন রে তুমি কৃষিকাজ জান না—
তোমার পতিত জমি আবাদ করলে ফলত সোনা।

সঙ্গীতচর্চ্চার পর দুর্য্যোধনকে ডাকিতে লাগিল

দুর্য্যোধন প্রবেশ করিল

মহাজন ॥ ওহে, কাল থেকেই অর্জ্জুনের বাড়ীতে লোক লাগিয়ে দাও। ঘরগুলি ভেঙে ফেলে জমিটাতে হাল দাও—ওখানে ভাল তামাক হবে।

দুর্য্যোধন ॥ যে আজ্ঞে।

দুর্য্যোধন চলিয়া গেল। যুধিষ্ঠির পুনরায় গান সুরু করিল। হঠাৎ বাহিরের দিকে দৃষ্টি পড়িল।

কে? ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

নেপথ্য হইতে উত্তর আসিল—"আমি"

মহাজন ॥ 'আমি' কে? সবাই তো 'আমি'।

অর্জ্জুন ॥ (প্রবেশ করিয়া কঠোর কণ্ঠে) আমি অর্জ্জুন।

মহাজন ॥ অর্জ্জুন! ওরে বাবা! তুমি কোত্থেকে?

অর্জ্জুন ॥ জেল থেকে।

মহাজন ॥ অ্যাঁ! তোমার জেল হয়েছিল? তবে যে শুনলুম⋯ ⋯

অর্জ্জুন ॥ আপনি কি শুনেছেন তা আমি শুনতে চাই না। আমি যা শুনেছি তাও বলতে চাই না। আমি আজ রাতেই কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। দুর্গা আর লক্ষ্মণকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে—যদি না পাই, আপনার সঙ্গে আমি আবার দেখা করব।

মহাজন ॥ ও বাবা, এ খুন করবে নাকি! দুর্য্যোধন, ও দুর্য্যোধন!

অর্জ্জুন ॥ না, আজ কোন ভয় নাই। কিন্তু একা যদি ফিরে আসি, দুর্য্যোধনের বাবাও আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না।

দ্রুত প্রস্থান করিল। দুর্য্যোধনের প্রবেশ

মহাজন ॥ তোমরা সব কোথায় থাক? ডাকলে কা'কেও পাওয়া যায় না!

দুর্য্যোধন ॥ কেন, ছিলাম তো! অর্জ্জুনের বাড়ীতে হাল দেবার লোক ঠিক করছিলাম।

মহাজন ॥ না না, হালটাল দিতে হবে না। ও-বাড়ী যেমন আছে—তেমনি থাক্।

দুর্য্যোধন ॥ যে আজ্ঞে।

ভাবিতে লাগিল, এ আবার কি ব্যাপার!

*　　*　　*　　*

উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে সহসা যখন কাহারও পদস্খলন হয়, সেই মুহূর্ত্তেই হয়তো তাহার জীবনান্ত হয় না। তাহার জীবনের শোচনীয় পরিণতি দেখা যায় ঠিক তখনই যখন নিম্নের কঠিন সানুদেশের সংস্পর্শে আসিয়া উহার সহিত তাহার দেহের সংঘর্ষ বাধে। অর্জ্জুনের গৃহত্যাগের পরও যতদিন দুর্গা নিজের বাড়ীতে ছিল, শত দুঃখ ও শত কষ্টের মধ্যেও তাহার অন্ততঃ এইটুকু ছিল সান্ত্বনা যে, নিজের আশ্রয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব লইয়া সে স্বাধীন জীবন কাটাইতেছে। কিন্তু এখন সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছে, পরের আশ্রয়ে পরের গলগ্রহ হইয়া এই প্রাণান্তকর উঞ্ছবৃত্তির বেদনা কতখানি।

দুর্গা ও লক্ষ্মণ দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম করে এবং গৃহকর্ত্রী ও ভুলোর সেবা-পরিচর্য্যায় সর্ব্বদা তটস্থ। কিন্তু এত করিয়াও তাহাদের মন পায় নাই—পদে পদে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার অবধি নাই।

দুর্গা রান্নাঘরে কর্ম্মব্যস্ত। এমন সময় দেখা গেল, ভুলো লক্ষ্মণের কান ধরিয়া টানিতে টানিতে দরজার সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল।

ভুলো ॥ এই যে লক্ষ্মণের মা, তোমার ছেলেকে খুঁজে পাচ্ছিলে না—আমার বই দেখে চুরি ক'রে ছবি আঁকা হচ্ছিল। তা, মজাটা টের পেয়েছেন—দিয়েছি দুই ঘুষি বসিয়ে। ফের যদি কখনো দেখি, লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবো।

দুর্গা ॥ (দরজার সম্মুখে আসিয়া লক্ষ্মণের দিকে তাকাইয়া) হুঁ! কর্ত্তামা না তোকে বাজারে যেতে বলেছিলেন, লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ ॥ বলেছি তো আমার ভয় করে—যদি পথে হারিয়ে যাই!

দুর্গা ॥ পথে ঘাটে দেখা হবে—সেই আশাতেই তো এখানে এসেছি; কিন্তু বাড়ীর বাইরে না গেলে তাঁর দেখা তো কোনদিনই পাবি না! আমাদের কি চিরদিন এমনি ক'রেই কাটাতে হবে রে?

শেষের দিকে তাহার গলায় স্বর কাঁপিতে লাগিল। লক্ষ্মণ নীরব।

দুর্গা ॥ কি, যাবি নে?

লক্ষ্মণ ॥ বলেছি তো, আমি যাব না—আমার বড় ভয় করে।

ইতিমধ্যে গৃহকর্ত্রীর প্রবেশ

মাতঙ্গিনী ॥ (ভঙ্গী-সহকারে) ওরে আমার নবাবপুত্তুর! যেন কচি খোকা! তা' তোর খোরাকটাও যদি খোকার মতই হ'ত তা হ'লেও না হয় বুঝতুম যে হ্যাঁ! ওরে ছোঁড়া! বাজারে যদি যাবি না, তবে তোর ঐ হাতীর খোরাক আসবে কোত্থেকে রে ড্যাক্‌রা?

দুর্গা ॥ বুড়ো ধাড়ি, হারিয়ে গেলেই হ'ল? খালি ফাঁকি! যা, যা বলছি।

চড় মারিল। লক্ষ্মণ চড় খাইয়া মর্ম্মাহত হইল ও মায়ের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

*   *   *   *

জীবনে মা'র হাতের প্রথম চড় খাইয়া লক্ষ্মণ জনাকীর্ণ ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইল। চাপা কান্নায় তাহার বুক ফুলিয়া উঠিতেছিল। লক্ষ্যহীন অবস্থায় পথ চলিতে চলিতে পথের ধারে বসিয়া পড়িয়া এইবার প্রাণ খুলিয়া

কাঁদিতে সুরু করিল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল বিপরীত ফুটপাথের দিকে। সে দেখিল, কতকগুলি কৌতূহলী দর্শকের ভীড়ের কেন্দ্রবর্ত্তী হইয়া এক বাঁদরওয়ালা বাঁদরনাচের ধুম লাগাইয়াছে। লক্ষ্মণ সেদিকে ছুটিল। কিন্তু খেলা তখন প্রায় শেষ। লক্ষ্মণ নাচ দেখিবার উদ্দেশ্যে বাঁদরওয়ালার পিছনে চলিতে লাগিল। এইবার আরও এক জায়গায় নাচ সুরু হইল। সে মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল এবং কিছুক্ষণেই তাহার মনের সকল দুঃখ ও ক্ষোভ দূর হইয়া গেল। নাচের শেষে যখন তাহার বাড়ীর কথা মনে পড়িল— তখন সে দিকভুল করিয়া ক্রমাগত চলিতে সুরু করিল সম্পূর্ণ ভুল পথে। অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন প্রভুগৃহের কোন সন্ধান করিতে পারিল না তখন রীতিমত ভয় পাইয়া পথের ধারে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় দুঃখী নামে তাহার সমবয়স্ক ভিক্ষুক বালক তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া কহিল—

দুঃখী ॥ কাঁদছ কেন ভাই? খিদে পেয়েছে? খাবে?

লক্ষ্মণ ॥ কি খাব? আমার তো পয়সা নাই।

দুঃখী ॥ দূর্ বোকা। পয়সা কি সবার কাছে সব সময় থাকে? খাও-না—এই নাও।

খাবার দিল। লক্ষ্মণ খাইতে লাগিল

আজ আমি দিচ্ছি—তুমি খাচ্ছ, কাল তুমি দেবে—আমি খাব। এমনি ক'রেই তো দুনিয়াটা চলছে ভাই। কোন বাড়ীতে যাবে?

লক্ষ্মণ ॥ কর্ত্তামার বাড়ীতে।

দুঃখী ॥ কর্ত্তামাটা কে ?

লক্ষ্মণ ॥ ঐ যে কর্ত্তামা, ঐ যে খুব মোটা মেয়েমানুষটা—গা-ভরা গয়না। মা আর আমি সেই বাড়ীতে চাকরি করি। সেটা কোন্ বাড়ী ভাই ? এই কাছেই—আমায় দেখিয়ে দেবে ?

দুঃখী ॥ মানে—পথ হারিয়েছ ? কত নম্বর ?

লক্ষ্মণ ॥ নম্বর ? তা তো জানি না।

দুঃখী ॥ রাস্তার নাম ?

লক্ষ্মণ ॥ এই কলকাতারই রাস্তা।

দুঃখী ॥ এবার বুঝেছি। এস আমার সঙ্গে। আমি বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

লক্ষ্মণ ॥ বাঁচালে তুমি—আমায় বাঁচালে।

দুইজনে কিছু পথ অগ্রসর হওয়ার পর হঠাৎ দুঃখী লক্ষ্মণকে কহিল—

দুঃখী ॥ এই, তুই একটু স'রে দাঁড়া, দুটো পয়সা কামিয়ে নিই।

পথের ধারে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া করুণ স্বরে আরম্ভ করিল—

দুঃখী ॥ আজ দু'দিন কিছু খেতে পাইনি বাবা। মুড়ি খেতে দুটো পয়সা দাও বাবা—

পথচারিগণের নিকট হইতে তাহার হাতে পয়সা পড়িতে লাগিল

দুঃখী ॥ দেখ্‌লি ? দু'মিনিটে চার পয়সা কামাই হল। চল্।

* * * *

লক্ষ্মণের হাত ধরিয়া দুঃখী বহু পথ ঘুরিয়া শেষে একটি সরু গলির মধ্যে আসিয়া পড়িল। লক্ষ্মণ ভয় পাইয়া কহিতে লাগিল—

লক্ষ্মণ ॥ না না, এ গলি নয়। এত সরু গলি নয়। সেটা একটা বড় রাস্তা। বাড়ীর কাছেই বড় একটা বাজার—বাজারের মাথায় মস্ত বড় ঘড়ি—

দুঃখী ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই গলি দিয়েই সে-রাস্তায় পড়ব।

একটি পানের দোকানে ঢুকিল

লক্ষ্মণ ॥ বা রে, ওখানে কেন? মা'র কাছে নিয়ে চল।

দুঃখী ॥ হ্যাঁ রে, হ্যাঁ! আয়-না।

ভিতরে গেল তারা। মুহূর্ত্তে যেন একটি ভোজবাজির খেলা দেখা গেল। পানের দোকানের বড় আয়নাখানি সরিয়া গেল এবং উহারই পিছনে এক গুপ্তপথ দৃশ্যমান হইল। অর্থাৎ লক্ষ্মণ এক ছেলেধরার গুপ্ত আড্ডায় প্রবেশ করিয়াছে।

আড্ডার মালিক কৃষ্ণপ্রসাদ লক্ষ্মণের প্রতি তাহার ভীষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল—

কৃষ্ণপ্রসাদ ॥ আরেঃ! আরে, এ বেড়ালছানাটা কে রে? এ যে নতুন দেখছি।

দুঃখী ॥ ওর মাকে হারিয়েছে।

কৃষ্ণপ্রসাদ ॥ আরে মা'র কাছে গিয়ে কি হবে? কত ছেলে আছে এখানে—হুলো ভুলো হাবলা ঝণ্টু—কত দোস্ত হবে তোর।

লক্ষ্মণ ॥ বাঃ, আমার মা'র যে কেউ নেই।

কৃষ্ণপ্রসাদ ॥ কেউ নেই? আরে সেইজন্যেই তো এখানে থাকবি। গান শিখবি, কাজকর্ম্ম শিখবি, অনেক পয়সা কামিয়ে মা'র কাছে যাবি।

কৃষ্ণপ্রসাদ বীভৎসভাবে হাসিয়া উঠিল

*   *   *   *

এদিকে মাতঙ্গিনী দেবীর বাড়ীতে দুর্গার অবস্থা বর্ণনাতীত। সে নিজের হাতে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, লক্ষ্মণকে—ভয়ে বালক পথের বাহির হইতে চায় নাই তথাপি তাড়াইয়া দিয়াছে। নিজের পায়ে সে নিজে কুঠার মারিয়াছে। অনুতাপে দুঃখে দুর্গার জীবন্মৃত অবস্থা।

মাতঙ্গিনী ॥ এই সারাদিন ধ'রে হাপিত্যেস ক'রে লাভটা হচ্ছে কি শুনি? সে ছেলে যদি ফিরবার হ'ত, তখনি ফিরে আসত। এই তো বাজার—দু'মিনিটের পথ। যেতে-আসতে গাড়ীচাপা পড়বারও ভয় নেই। আমি বলছি, ও পালিয়েছে। তা, তুমি বাছা যা-দুটি মুখে দেবার, দিয়ে নাও। না খেয়ে উপোস ক'রে থাকলে আমার ছেলের অকল্যেণ হয় না? আচ্ছা সব লোক নিয়ে আমার ঘরকন্না। একগাদা বাসনও তো প'ড়ে রয়েছে।

দুর্গা ॥ যাচ্ছি মা।

*   *   *   *

ছেলেধরার গুপ্ত আড্ডায় কৃষ্ণপ্রসাদ ও লক্ষ্মণ

কৃষ্ণপ্রসাদ ॥ তোর কাছে কত ছিল? ঠিক বলিস্।

লক্ষ্মণ ॥ আট আনা।

কৃষ্ণপ্রসাদ ॥ মিথ্যে কথা।

লক্ষ্মণ ॥ হ্যাঁ এই আছে—এই যে।

লক্ষ্মণ খুঁজিয়া দেখিল—পয়সা নাই! কৃষ্ণপ্রসাদ হাসিয়া উঠিল।

কৃষ্ণপ্রসাদ ॥ মিথ্যে বললি তো ?

লক্ষ্মণ ॥ (অবাক্ হইয়া) সত্যি বলছি। আমার ট্যাঁকে ছিল—এই একটু আগেও ছিল।

কৃষ্ণপ্রসাদ ॥ হাওয়া হয়ে কর্পূরের মত উড়ে গেল, না ? আও······

হাত বাড়াইয়া শূন্য হইতে পয়সা ধরিয়া আনিল

লক্ষ্মণ ॥ (আশ্চর্য্য হইয়া) তাই তো ! কি ক'রে এল ?

কৃষ্ণপ্রসাদ ॥ শিখবি এসব ? থাকবি এখানে ? কত পয়সা হাওয়া থেকে টেনে আনতে পারবি। এখানে থাকলে কত বিদ্যে শিখবি। কত টাকা রোজগার করবি, আরামসে থাকবি—ঐ ওরা যেমন আছে। তারপর তোর মাকে আর ঝিগিরি করতে হবে না। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা হাতে তুলে দিতে পারবি। থাকবি—কেমন ? (দুঃখীর প্রতি) এই ব্যাটা শেয়াল, বেড়ালছানাটাকে নিয়ে যা। আজ থেকে ওর নাম হ'ল—'হুলো', বুঝলি ?

* * * *

কলিকাতার রাজপথে অর্জ্জুন রিক্সা টানিতেছে

আরোহী ॥ এ কি, থামলে যে ?

অর্জ্জুন উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া গেল—তাহার মনে হইল ঐ যে তাহার লক্ষ্মণ।

অর্জ্জুন ॥ লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ !

একটি বালকের কাছে আসিয়া নিজের ভ্রম বুঝিল

আরোহী ॥ ব্যাপার কি ? কি দেখে এলে ?

অর্জ্জুন ॥ না, সে নয় !······না না, কিছু না !

*　　　　*　　　　*　　　　*

কলিকাতার একটি রাস্তার মোড়। কয়েকটি বালক সহ দুঃখী শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। দূরে একটি বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া দুঃখী প্রস্তুত হইতেছিল পকেটকাটার উদ্দেশ্যে।

দুঃখী ॥ এই, ঐ একটা বুড়ো আসছে। আমি কলার খোসাটা ফেলছি—বুড়ো যদি প'ড়ে যায়, সবাই দৌড়োবি—জল জল ব'লে চেঁচাবি—সেই ফাঁকে বুঝলি…!

মোড়ে পৌঁছিয়া বৃদ্ধ সেই কলার খোসায় পা পিছলাইয়া ফুটপাতের উপর পড়িয়া গেলেন। বালকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া চীৎকার সুরু করিল। কেহ বা তাঁহাকে ধরিয়া তুলিবার ছল করিয়া তাঁহার পকেটে হাত দিল।

১ম বালক ॥ প'ড়ে গেল, প'ড়ে গেল—

২য় বালক ॥ খুব চোট লেগেছে—

৩য় বালক ॥ জল—জল—

৪র্থ বালক ॥ অ্যাম্বুলেন্স—

৫ম বালক ॥ এই ভাই, কেউ একটু বরফ আনতে পার—

বৃদ্ধ ॥ (উঠিয়া) এ কি আমার মানিব্যাগ নিয়ে গেল যে! মানিব্যাগ নিয়ে পালাল। ধরুন—ধরুন—ঐ যে ছেলেটা পালাচ্ছে—

চতুর্দ্দিক হইতে বিক্ষিপ্ত জনতা সোরগোল করিয়া পকেটকাটার পিছনে ছুটিল। কিন্তু এই ধরণের ঘটনায় সচরাচর অনেক ক্ষেত্রেই যাহা দেখা যায় এখানেও তাহাই হইল। উদোর পিণ্ডি গিয়া পড়িল বুধোর ঘাড়ে। লক্ষ্মণ এই ঘটনাস্থলের কিছু দূরে

দাঁড়াইয়াছিল। এই গণ্ডগোল দেখিয়া সেও ছুটিতে আরম্ভ করিল। ইহার পরিণতি হইল এই যে, পকেটকাটা মনে করিয়া ক্রুদ্ধ জনতা তাহাকেই ধরিয়া ফেলিল।

জনতা ॥ মার—মার! শয়তানের বাচ্চা, তোমার পকেটমারা বের ক'রে দিচ্ছি।

লক্ষ্মণ চোরের মার খাইতে লাগিল

লক্ষ্মণ ॥ উঃ—মাগো— মা!······

জনতা তাহাকে থানার দিকে লইয়া চলিল

*　　*　　*　　*

মুচিপাড়া থানার মধ্যে লক্ষ্মণ দারোগাবাবুর সম্মুখে

দারোগা ॥ ব্যাগ কোথায় বল, নইলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো।

লক্ষ্মণ ॥ ব্যাগ আমি নিইনি।

দারোগা ॥ নাওনি!

এমন সময় উক্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ছুটিয়া আসিলেন

বৃদ্ধ। দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান—এ ছেলেটা আমার ব্যাগ নেয়নি। যে নিয়েছে তার একটা চোখ ট্যারা, মুখে বসন্তের দাগ আছে।

দারোগা ॥ আরে মশাই, সেটা আগে বলতে হয়।

বৃদ্ধ ॥ আরে মশাই, বলবার ফুরসত পেলাম কৈ?

দারোগা ॥ দেখুন দেখি, ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ইস্, নখ দিয়ে রক্ত পড়ছে! রাস্তার লোকেই মেরে সাবাড় করেছে। এখন দেখি এ মরা মেরে খুনের দায়ে পড়ব!

বৃদ্ধ ॥ কাউকে দিয়ে একটা ট্যাক্সি আনিয়ে দিন। আমি বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। দেখি চেষ্টা ক'রে ছেলেটাকে যদি বাঁচাতে পারি।

*　　　*　　　*　　　*

বৃদ্ধের বাড়ীতে লক্ষ্মণ অজ্ঞান অবস্থায় শয্যায় শায়িত। বৃদ্ধ টেলিফোনে কথা বলিতেছেন—

বৃদ্ধ ॥ Burrabazar 718? আমি আপনাদের পাড়ার বিপিন বোস। দয়া ক'রে শীগ্‌গির আমার বাড়ী আসুন। একটা ছেলে বাঁচে কিনা সন্দেহ।

*　　　*　　　*　　　*

ডাক্তার আসিয়া রোগী পরীক্ষা করিয়া ইনজেকশন দিলেন। শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া—বৃদ্ধ বিপিনবাবু।

বিপিন ॥ বেচারি! ক'টা টাকার জন্যে মিছিমিছি—

ডাক্তার সেন ॥ আপনি ভাববেন না। শীগ্‌গিরই জ্ঞান হবে। বিকেলে আমাকে একবার খবর দেবেন।

চলিয়া গেলেন। কক্ষে প্রবেশ করিলেন মানদা—বিপিনবাবুর স্ত্রী। লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া তিনি বসিলেন।

বিপিন ॥ শেষে আমার কপালে এই ছিল! শিবরাত্রির সলতে একটি ছেলে—সে-ছেলে আমার বাঁচল না—আজও তোমার কোল খালিই রইল—তার ওপর আবার এই পরের ছেলেকে মেরে ফেললাম!

মানদা ॥ ছেলেটার বোধহয় জ্ঞান হচ্ছে!

বিপিন ॥ খোকা! খোকা!

লক্ষ্মণ ॥ (চক্ষু মেলিয়া) কে?…না, আমি চুরি করিনি—আমি চুরি করিনি।

বিপিন ॥ না বাবা, তুমি চুরি করনি। তোমার কোন ভয় নাই।

মানদা ॥ এই দুধটুকু খাও বাবা।

লক্ষ্মণ ॥ মা !···না না তুমি তো মা নও, আমার মা কোথায় ? আমার মা কোথায় ?

মানদা ॥ দুধটুকু খাও—একটু সুস্থ হ'লে তবে তো তাঁর কাছে যেতে পারবে।

*   *   *   *

মাণিকতলা বাজারের সম্মুখে লক্ষ্মণ সহ বিপিনবাবু বাড়ী খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

বিপিন ॥ তা হ'লে বাজার পেলুম—বাজারের ওপর ঘড়িও পেলুম। তোমার সেই বড় রাস্তাও তবে এই। এইবার দেখ তো বাবা চিনতে পার কিনা কোন্ বাড়ী ?

পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীগুলির সম্মুখে যাইয়া একে একে লক্ষ্মণকে দেখাইতে লাগিলেন। দেখা গেল, একটি বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া আছে দুর্গা। হঠাৎ দুর্গা তাহার হারানিধিকে দেখিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—

দুর্গা ॥ লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ ॥ মা ! ঐ যে আমার মা—ঐ যে আমার মা !

দুর্গার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল

*   *   *   *

কল্যাণপুরে অর্জ্জুনের ভাঙ্গা বাড়ীর সম্মুখে বিপিনবাবু, দুর্গা, লক্ষ্মণ, টিয়া ও অন্যান্য সকলে। মহাজন অর্জ্জুনের বাড়ীর দরজার তালা খুলিয়া দিল।

মহাজন ॥ আমি তো এই চেয়েছিলাম যে, আমার পাওনা টাকা মিটিয়ে দিয়ে এরা সব ফিরে এসে আবার এখানে বসবাস করে। তা

কৃষাণ

আপনারা হলেন গিয়ে কলকাতার লোক—সদাশয় মহাশয় ব্যক্তি, নইলে পরের দুঃখে কারও প্রাণ এমন ক'রে কাঁদে! পরের দেনা কেউ এমনি ক'রে মিটিয়ে দেয়? না না, আপনার মশাই পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বিপিন॥ না না, সে কি? আপনি অতি সজ্জন—তাই বাড়ী ফিরিয়ে দিলেন। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

* * * *

আঙিনার কোণে একটি গন্ধরাজফুলের গাছের নিকট দাঁড়াইয়া টিয়া ও লক্ষ্মণ:

লক্ষ্মণ॥ দেখেছ—দেখেছ টিয়া, তোমার সেই গন্ধরাজের চারা? সেই যে তুমি দিয়েছিলে—আমি এইখানে পুঁতেছিলাম। আজ কেমন ফুল ফুটেছে!

টিয়া॥ কেন ফুটেছে জান মশাই? আমি চুপি চুপি এসে ওকে জল দিতুম। তবে-না আজ ফুল ফুটেছে!

লক্ষ্মণ॥ কি সুন্দর গন্ধ! দেখতে কি সুন্দর! তোমার খোঁপায় খুব ভাল মানাবে।

খোঁপায় গুঁজিয়া দিতে গেল। টিয়া লজ্জিত হইয়া আপত্তি করিল বটে, কিন্তু ফুলটি যথাস্থানেই পৌঁছিল।

টিয়া॥ বা রে! যাও!

* * * *

রুক্মিণীর হইয়াছে এখন আর-এক মুস্কিল। দুর্গার অগোছালো ঘরসংসার দেখিয়া তাহার অস্বস্তির অন্ত নাই—এ কি চোখে দেখা যায়? তাই সে নূতন করিয়া দুর্গার সংসার পাতিয়া দিতে ব্যস্ত। কোমরে কাপড় বাঁধিয়া সে কাজে লাগিয়া গিয়াছে।

রুক্মিণী ॥ এ তোরঙটা কোথায় ছিল ভাই ?

দুর্গা ॥ ঐখানে। কিন্তু ভাই, তুমি কেন এত খেটে মরছ ?

রুক্মিণী ॥ আবার তোমাদের পেলাম—এ কি আজ আমার কম আনন্দ ভাই ? ঝগড়াও করব, হিংসেও করব। পাড়াপড়শী না থাকলে এসব কা'র সঙ্গে চলবে ? সত্যি ভাই দুর্গা, তোমরা যে আমার কতখানি, তা আগে বুঝিনি। তোমরা চ'লে গেলে তবে বুঝলুম।

দুর্গা ॥ তোমার ঠাকুরপো তোমাকে কোন ঠিকানা দিয়ে গেছে ভাই ?

রুক্মিণী ॥ সে বুঝি তেমনি লোক ? তোমাকেই ঠিকানা দিলে না, আর দেবে আমাকে ? দু' দণ্ড ব'সে ভাত খাবারও সময় হ'ল না।

দুর্গা ॥ তুমি তো তবু তার দেখা পেলে ; কিন্তু এত ক'রেও যে আমি তাঁকে পেলাম না।

রুক্মিণী ॥ কি ক'রে পাবে ? ঐ সর্ব্বনাশী—ঐ বাঈজী যে তাকে বশ করেছে। কিন্তু ভগবান আছেন ভাই। তোমার সিঁথের সিঁদুরের টানে একদিন সে ফিরে আসবেই আসবে—দেখে নিও।

দুর্গা কত কি ভাবিতে লাগিল

লক্ষ্মণ আসিয়া বলিল—

লক্ষ্মণ ॥ মা, দাদুকে বল, আমি কিন্তু আর কলকাতায় ফিরে যাব না।

দুর্গা ॥ ছিঃ, তোমার নতুন দাদু যে তা হ'লে মনে বড় দুঃখ পাবেন। তোমার নতুন দিদিমা তোমার পথ-চেয়ে বসে আছেন। দেখেছ তো ওঁরা কেমন ভাল লোক। কত ওঁদের মায়া। ওঁরা তোমায় লেখাপড়া শেখাবেন—মানুষ করবেন। তোমার বাবা যখন ফিরে আসবেন, দেখে তাঁর কত আনন্দ হবে বলতো ? আর সে-আশাতেই তো বেঁচে আছি বাবা।

আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল

*　　　*　　　*　　　*

কলিকাতার জনাকীর্ণ পথে অর্জ্জুন এক আরোহীকে লইয়া রিক্সা টানিতেছে। মুখের গোঁফদাড়ি আরও ঘন হইয়াছে, কিন্তু তাহার শরীর শীর্ণ—কাজ না করিলে উপায় নাই তাই। আর দ্বিতীয় কথা, পথে-ঘাটে হয়তো একদিন তাহার দুর্গা ও লক্ষ্মণকে পাইবে, এই আশায়ও সে এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

রিক্সা টানিতে টানিতে হঠাৎ সে থামিয়া গেল, আরোহী বিস্মিত হইল। অর্জ্জুন পথচারী একটি স্ত্রীলোকের দিকে দৌড়িয়া গেল—

অর্জ্জুন ॥ দুর্গা! দুর্গা!

নিকটে যাইয়া তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিল। হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলে আরোহী বিরক্ত হইয়া কহিল—

আরোহী ॥ কেমন লোক হে তুমি? পথের ওপর এমনিভাবে রিক্সা ফেলে…বে-আক্কেল!

অর্জ্জুন নীরব রহিল

নাও, রিক্সা তোল!

অর্জ্জুন তখন যেন অন্য জগতে

অর্জ্জুন ॥ উঃ! আমায় মাপ করবেন! আমি যাব না।

আরোহী ॥ অ্যাদ্দূর এনে যাবে না মানে? যেতেই হবে। পয়সা নেবে না?

অর্জ্জুন ॥ না, নাবুন—আপনি নাবুন—

আরোহী ॥ কি রে বাবা! মাথায় ছিট আছে নাকি? নামছি—নামছি।

*　　　　*　　　　*　　　　*

ঐখানে বংশী নামে জনৈক রিক্সাওয়ালার সঙ্গে দেখা হইল অর্জ্জুনের। তাহার রিক্সার আরোহী অস্থির হইয়া উঠিয়াছে—রিক্সার মন্থরগতির জন্য।

আরোহী॥ ব্যাটা যেন সাবু খেয়ে রিক্সা চালাচ্ছে! জোরে চল!

বংশী॥ আঃ, আমি আর পারছি না বাবু।

রিক্সা থামাইল

আরোহী॥ পারছ না মানে? কলুটোলা থেকে এখানে আসতে তো আধঘণ্টা লাগিয়ে দিযেছ! চল।

অর্জ্জুন॥ (অগ্রসর হইয়া) বংশীকাকা, তুমি আমার রিক্সা নিয়ে আড্ডায় যাও—আমি তোমার সোয়ারী পৌঁছে দিচ্ছি। ভাড়া কত ঠিক হয়েছে?

আরোহী॥ বারো আনা।

অর্জ্জুন বংশীর রিক্সা লইয়া ছুটিয়া চলিল। বংশী অর্জ্জুনের রিক্সা লইয়া অন্যপথে চলিয়া গেল।

আরোহী॥ এটা কি হল হে?

অর্জ্জুন॥ ও বুড়ো বেরামী লোক—দেখছিলেন না, টানতে পারছিল না।

আরোহী॥ যাক্ ও বাঁচ্ল—আমিও বাঁচলাম। কলুটোলা থেকে এখানে আসতে আধঘণ্টা লাগিয়ে দিয়েছে! ও তোমার কেউ হয় নাকি?

অর্জ্জুন॥ না স্যর, তবে এক আড্ডার লোক।

*　　　　*　　　　*　　　　*

একটি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ। অর্জ্জুন দুইটি ছাত্রকে রিক্সায় চড়াইয়া এখানে পৌঁছাইয়া দিল। ১ম বালক অর্জ্জুনকে ভাড়া দিতে গেল।

অর্জ্জুন ॥ না খোকা, থাক্।

২য় বালক ॥ বা রে! ভাড়া নেবে না?

অর্জ্জুন ॥ তোমরা তো আমাকে ডাকনি—আমিই তোমাদের ডেকে তুলেছি।

১ম বালক ॥ না না, সে হয় না। তুমি ভাড়া নাও।

অর্জ্জুন ॥ না খোকা, ও দিয়ে তোমরা মিষ্টি কিনে খেয়ো—রসগোল্লা। আমার ছেলে রসগোল্লা খেতে খুব ভালবাসত।

চলিয়া গেল

২য় বালক ॥ আরেঃ! মাথায় ছিট্ আছে নাকি!

এমন সময় একখানি গাড়ী হইতে বই-হাতে নামিল লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ ॥ কা'র কথা বলছ?

১ম বালক ॥ (দূরে অর্জ্জুনকে দেখাইয়া) ঐ যে রিক্সাওয়ালা—ঐ যে দেখছ যাচ্ছে—ভাড়া নিলে না; বলে, রসগোল্লা কিনে খেয়ো—আমার ছেলে খেতে খুব ভালবাসত।

লক্ষ্মণ ॥ বাঃ রে তাই নাকি! আমিও যে রসগোল্লা খেতে ভালবাসি। কিন্তু দেয় কে!

২য় বালক ॥ কপালে থাকলেই মেলে! এস!

* * * *

সুদীর্ঘ দশটি বৎসর পরের কথা। এই সময়ের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক-কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অনেক দুঃখ সহিয়া যেন সহনশীলতার এক চরম পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে আজ দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোক। লোকের মনে সেই দশ

বছর পূর্ব্বের চিন্তাধারাও এখন আর নাই—তাহাতে অনেক পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে; এমন কি অশিক্ষিত-নিরীহ কৃষকগণও চিরন্তন পীড়ন ও অবিচারের বিরুদ্ধে আজ প্রতিবাদ জানায়, মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চায় ও বিক্ষুব্ধ জনমত সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে। তাহারা এখন বুঝিতে পারে, ভগবানের দেওয়া আলো-বাতাসের উপর যেমন সকলেরই একটি সহজ ও স্বাভাবিক অধিকার আছে, তেমনি কৃষকগণের একটা সহজ ও স্বাভাবিক দাবী আছে তাহার সৃষ্ট মৃত্তিকার উপর—যাহার বুকে তাহারা জলে ভিজিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে সোনার ফসল ফলায়।

কল্যাণপুরে এমন একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন আনিয়াছে লক্ষ্মণ। সুদীর্ঘ দশ বৎসর সে কলিকাতায় তাহার অর্থশালী 'নতুন দাদু'র স্নেহ ও উচ্চ আদর্শের মধ্যে প্রকৃত মানুষ হইয়া কিছুদিন হয় গ্রামে আসিয়াছে। ইহারই মধ্যে সে গ্রামের উন্নয়নে মন দিয়াছে, সমবায়-সমিতি খুলিয়াছে এবং সংগঠন-মূলক আরও অনেক রকম কাজেরই সে উদ্বোধন করিয়াছে। নিজ গ্রাম ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের কৃষকগণকে তাহার সমবায়-সমিতির সভ্য করিয়া তাহাদিগকে সে বুঝাইয়াছে যে, গ্রামে যেসকল পতিত জমি আছে, গ্রামের সমবায়-সমিতি হইতে ন্যায্য মূল্যে দখল লইয়া তাহাতে চাষ করিতে হইবে। ইহারই ঘটনাস্থলে লক্ষ্মণের ও জোতদার-মহাজনের লোকেদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধিবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। উভয় পক্ষই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।

দুর্যোধন ॥ মহাজনের জমিতে হাল জুড়লে মাথা থাকবে না। হাল তুলে দাও।

লক্ষ্মণের পক্ষ ॥ খবরদার—জমিতে পা দিয়েছ কি মরেছ।

লক্ষ্মণ ॥ গাঁয়ের সব জমি ছলে বলে কৌশলে তোমরা গ্রাস করেছ। নিজেরাও চাষ করবে না, আমাদেরও চাষ করতে দেবে না!

দুর্যোধন ॥ আমাদের জমি, আমরা যেমন খুসী ফেলে রাখব। মুরোদ থাকে কিনে নাও—তারপর হাল দিতে এস।

লক্ষ্মণ ॥ আমাদের সমবায়-সমিতি সে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তোমরা ন্যায্য দামের দশগুণ বেশী হেঁকে ফিরিয়ে দিয়েছ। তা ব'লে আমরা চুপ করে থাকব না। এ গাঁয়ে কোন পতিত জমি থাকবে না। চালাও হাল।

লক্ষ্মণের দল হাল চালাইতে সুরু করিল

দুর্যোধন ॥ (নিজের দলের লোকদের প্রতি) তোমরা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? যাও ঝাঁপিয়ে পড়—মেরে হাড় গুঁড়ো করে দাও।

মহাজনের দল অগ্রসর হইয়া আসিল

লক্ষ্মণ। (সম্মুখে আসিয়া) দাঁড়াও ভাইসব। ভেবে দেখ, তোমরা কে? একদিন তোমাদেরও জমি ছিল। ওই মহাজন আর জমিদারের চক্রান্তেই তোমাদের সব গেছে। তাই আজ তোমরা দু'মুঠো ভাতের জন্যে তাদেরই গোলামী করছ—যারা তোমাদের জোতজমি সব কেড়ে নিয়েছে। ভাইসব, তোমরাও আমাদের সঙ্গে এস, আমাদের সমবায়-সমিতির সভ্য হও। যেখানে যত পতিত জমি আছে, এস আমরা জোর ক'রে চাষ করি—নিজেরা খেয়ে বাঁচি—বাংলাকে আবার সোনার ফসলে ভ'রে তুলি। এস, ফেলে দাও লাঠি।

মহাজনের দল লাঠি দূরে ফেলিয়া দিল

দুর্য্যোধন ॥ এই, কোথায় যাচ্ছিস তোরা ?

১ম লাঠিয়াল ॥ হাল ধরতে—ঐ ভায়েদের সঙ্গে চাষ করতে।

দুর্য্যোধন ॥ বেইমান!

১ম লাঠিয়াল ॥ বেইমান্! ফাঁকি দিয়ে যখন সব জমি কেড়ে নিয়েছিলে তখন কোথায় ছিল তোমাদের ইমান ? চ'লে আয় ভাইসব!

সকলেই তাহার নির্দ্দেশমত কাজে লাগিয়া গেল। দুর্য্যোধন নিষ্ফল রোষে ফুলিতে লাগিল।

* * * *

মহাজন যুধিষ্ঠির সামন্তর বাটীর মহাজনী সেরেস্তাঘর। যুধিষ্ঠির, তাহার পুত্র কুবের—ও কর্ম্মচারী দুর্য্যোধন গম্ভীর চিন্তামগ্ন।

কুবের ॥ মাথা নিচু ক'রে সহ্য করব সব ?—না।

দুর্য্যোধন ॥ বুঝলেন, মামলা করুন। নইলে এতবড় বিষয়টা গালে চড় মেরে জোর-জবরদস্তি ক'রে গাঁয়ের লোকে কেড়ে নেবে ?

মহাজন ॥ করব। কিন্তু এখন নয়। মামলার ঢের সময় আছে। ফসল ফলাচ্ছে—ফলাক্ না। ও ফসল আমারই গোলাতে উঠবে। কিন্তু আগেই আমি মামলার হাঙ্গামায় যেতে চাইনে। একটা সোজা রাস্তা মাথায় এসেছে।—দাঁড়াও, দেখি!

যুধিষ্ঠির মহাজন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। তাহার মস্তিষ্কে যেন এক দুর্ব্বোধ্য সয়তানের কাণ্ড-কারখানা সুরু হইল।

* * * *

লক্ষ্মণের বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে কল্যাণপুর সর্ব্বার্থসাধক

সমবায় সমিতির জন্য তিনটি ঘর নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্মুখে বোর্ড ঝুলিতেছে।

(১) "কল্যাণপুর সর্ব্বার্থসাধক সমবায়-সমিতি
চরখা-বিভাগ"

(২) "কল্যাণপুর সর্ব্বার্থসাধক সমবায়-সমিতি
বয়ন-বিভাগ"

(৩) "কল্যাণপুর সর্ব্বার্থসাধক সমবায়-সমিতি
কুটীরশিল্প-বিভাগ"

দেখা গেল, রুক্মিণী ও গ্রামের অন্যান্য মেয়েরা হাতের কাজ করিতেছে, দুর্গা তত্ত্বাবধান করিতেছে

*   *   *   *

মহাজন যুধিষ্ঠির সামন্ত নিজ বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছে। লক্ষ্মণ প্রবেশ করিল।

মহাজন ॥ এই যে এস বাবাজী, তোমারই অপেক্ষায় ব'সে আছি। দেখ লক্ষ্মণ, তোমাদের সঙ্গে আমার ব্যাপারটা আমি মিটিয়ে ফেলতে চাই।

লক্ষ্মণ ॥ আমরাও তাই চাই, জ্যাঠামশাই।

মহাজন ॥ বাঃ বাঃ বাঃ! তবে আর কি! কিন্তু বাবাজী, একটু বসতে হবে যে, আহ্নিকটা সেরে তারপর কথা বলছি। এস বাবাজী ভেতরে এস।

মহাজন লক্ষ্মণকে অন্দরে লইয়া গেল

মহাজন ॥ বস বাবাজী। টিয়া, দেখ্ কে এসেছে।

টিয়া ॥ কে, বাবা? ও লক্ষ্মণদা।

মহাজন ॥ দু'জনে ব'সে একটু গল্প কর—আমি আহ্নিকটা সেরে আসি।

চলিয়া গেল

টিয়া ॥ তুমি নাকি আজকাল আমাদের মস্ত শত্রু, লক্ষ্মণদা ?

লক্ষ্মণ ॥ তাই তো শুনি।

টিয়া ॥ তা ভালো। তবে কিনা, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয়, আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায়!

লক্ষ্মণ ॥ তাই নাকি ?

টিয়া ॥ তা নয় তো কি ? কিন্তু কি যে যুদ্ধ হচ্ছে কিছুই বুঝি না। এত বড় শত্রু তুমি, কিন্তু বাবা দেখলাম জামাই-আদরে ঘরে বসিয়ে গেলেন। এ কি রকম যুদ্ধ বল তো ?

লক্ষ্মণ ॥ যুদ্ধ বাইরে—ঘরে নয়। তোমাদের বাড়ীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেখছি।

টিয়া ॥ তুমি বুঝি বদলাও নি ?

লক্ষ্মণ ॥ না, তা কেন ? আমিও বদলেছি সত্য, কিন্তু তোমার মত নয়।

টিয়া ॥ ও! টিয়াকে বুঝি কাক মনে হচ্ছে ?

লক্ষ্মণ ॥ না, টিয়া আজ ময়ূর হয়েছে।

টিয়া ॥ হুঁ ? খুব কথা শিখেছ তো!

মহাজন সেখানে আসিল

মহাজন ॥ কৈ রে টিয়া, লক্ষ্মণকে সরবত-টরবত দিয়েছিস ?

টিয়া ॥ এই যা!—দেখেছ ?

ছুটিয়া গিয়া সরবত আনিয়া দিল। লক্ষ্মণ সরবত পান করিয়া কহিল—

লক্ষ্মণ ॥ আঃ! তোমার সরবতটা কি মিষ্টি, টিয়া! আর-এক গেলাস

আন দেখি। কিন্তু চিনি এত কম দিও না যেন। আর দেখ, একটু লেবুর রস দিয়ো।

মহাজন ॥ হ্যাঁ, ভাল ক'রে দিস্।

টিয়া ॥ দিচ্ছি বাবা।

চলিয়া গেল

লক্ষ্মণ ॥ এইবার বলুন, জ্যাঠামশাই।

মহাজন ॥ আমি বলছিলুম কি—এই যে মাটি নিয়ে কামড়াকামড়ি করছ, দরকারটা কি শুনি? আমার তো ঐ একটা মেয়ে। এ তুমি বাবা সবই নাও-না কেন?

লক্ষ্মণ ॥ আপনি যা বলছেন, আমি বুঝেছি। খুব আনন্দের কথা জ্যাঠামশাই। আপনি জানেন কিনা জানি না—ছোটবেলা থেকে এই স্বপ্নই আমার মনে। মাও এতে খুব খুসীই হবেন। আর বাবা যদি কোনদিন ফেরেন—তাঁরও কোন ক্ষোভের কারণ হবে না। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার ক'রে নেওয়া ভাল।

মহাজন ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, পরিষ্কার ক'রে নিতে হবে বৈ কি বাবা। বল, কি বলতে চাও।

লক্ষ্মণ ॥ বিষয়সম্পত্তি আপনি আপনার মেয়েকে যা দেবেন, সেটা আমাদের সমবায়-সমিতি ন্যায্য মূল্যে কিনে নেবে। এতে আপনার আপত্তি আছে?

মহাজন ॥ সমবায়-সমিতি! ঐ নামটাই যে আমি সহ্য করতে পারি না বাবাজী। তা ছাড়া আমার এই পতিত জমিগুলোও তোমরা জোর ক'রে চাষ করছ—এর কি হবে?

লক্ষ্মণ ॥ ও তো আপনার প'ড়েই ছিল। জমিদারকে ওর জন্যে যা খাজনা দেন, সমিতির কাছে আপনি বড়জোর সেই খাজনাটা আশা

করতে পারেন। আদালতে গেলে কি হবে জানি না, কিন্তু দেশের খাদ্যসংকট দূর করবার জন্যে ও-জমি আমরা চাষ করব; দখল আমরা ছাড়ব না। দেশের জন্যে হাজার-হাজার লোক গত চল্লিশ বছর ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে, জেলে গেছে, সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে—সে দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে ভাসছে জ্যাঠামশাই।

মহাজন ॥ টিয়া, টিয়া! এক গেলাস সরবত আনতে কি তোর এক মাস লাগবে?

টিয়া ॥ এই যে এনেছি বাবা।

মহাজন ॥ আমি উঠি। আমায় আবার সেরেস্তায় যেতে হবে।

চলিয়া গেল

লক্ষ্মণ ॥ হ্যাঁ, একেই বলে সরবত।

টিয়া ॥ আর আগেরটা?

লক্ষ্মণ ॥ আগেরটাও সরবত,—সে সরবত তোমার হাত থেকে রোজই কেড়ে খাই—মনে মনে।

টিয়া ॥ যুদ্ধ থামল?

লক্ষ্মণ ॥ উঁহুঃ, ভাল ক'রে বাধল।

টিয়া ॥ যুদ্ধ না ছাই। যুদ্ধই যদি হ'ত তবে তোমাকে এখানে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিতাম না। আর তুমিও আমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে পারলে ছেড়ে দিতে না।

*　　*　　*　　*

ওদিকে মহাজন সেরেস্তায় আসিয়া বসিল। তাহার মুখ কালবৈশাখীর মেঘের মত ঘনঘটাচ্ছন্ন।

মহাজন ॥ দুর্য্যোধন!

দুর্য্যোধন ॥ আজ্ঞে করুন।

মহাজন ॥ সোজা রাস্তায় হবে না—একটু বেঁকে যেতে হবে।

দুর্য্যোধন ॥ সে আমি আগেই বলেছিলাম। মাঝে থেকে ফৌজদারী করতে দেরী হয়ে গেল।

মহাজন ॥ আগে থানা, তারপর ফৌজদারী। কাছে এস—শোন।

*   *   *   *

ঘরে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সযত্নে স্থাপিত অর্জ্জুনের খড়মজোড়ার সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রণাম করিতেছিল দুর্গা, এমন সময় লক্ষ্মণ ডাকিতে ডাকিতে ঘরে প্রবেশ করিল। দুর্গা যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

লক্ষ্মণ ॥ মা, মা!

লক্ষ্মণ মাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল।

দুর্গা ॥ (অবাক হইয়া) হঠাৎ প্রণাম করছিস যে? কি হ'ল বাবা?

লক্ষ্মণ ॥ অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্সে—আমি সে-প্রলোভন জয় করেছি মা।

দুর্গা ॥ কি বলছিস তুই, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

লক্ষ্মণ ॥ টিয়ার বাবা জমি আর মেয়ে দিয়ে আমাকে কিনে নিতে চায়—কিনতে চায় আমার আদর্শকে।

দুর্গা ॥ (বুঝিতে পারিয়া) তা হ'লে আমাকে নয় (খড়ম দেখাইয়া) ঐখানে প্রণাম কর। তোর বাবা জলে ভিজে রোদ্দুরে পুড়ে আমাদের জন্সে লড়াই ক'রে গেছে। অভাব আর অনাহারে দিনের পর দিন কাটিয়েছে—তবু মাথা নোয়ায়নি সে—কেউ তাকে কিনতে পারেনি।

দুর্গা দাঁড়াইল। তাহার মুখে একটা দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল আর দুই চক্ষু হইতে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

*　　*　　*　　*

সেইদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ মহাজন তাহার এক অভাবনীয় বিপদের বার্ত্তা লইয়া দুর্গার নিকটে উপস্থিত হইল। দুর্গা ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল।

মহাজন ॥ একটু বিপদে প'ড়েই তোমার কাছে এসেছি লক্ষ্মণের মা।

দুর্গা ॥ সে কি ? আপনার আবার কি বিপদ ?

মহাজন ॥ শালী খবর পাঠিয়েছে, শাশুড়ীর কলেরা হয়েছে কলকাতায়। এখন-তখন ! সেবা-শুশ্রূষার লোক নিয়ে যেতে বলেছে। কাজেই, আমার মাসী পিসী—মানে বাড়ীর সকলকেই নিয়ে যেতে হবে রোগীর সেবা করতে। না গিয়েও পারি না। কিন্তু মেয়েটাই বা এখানে একা-একা থাকবে কি করে ? চাকর-বাকরের ভরসায় তো আর ফেলে যেতে পারি না ! বিপদটা দেখেছ ?

দুর্গা ॥ তা, এ আর বিপদ কি ? টিয়া আমার কাছেই থাকবে। আমি গিয়ে তাকে নিয়ে আসছি।

মহাজন ॥ তাকে আমি নিয়েই এসেছি। টিয়া, আয় মা—আয়। বলিনি যে তোর কাকীমা থাকতে তোর কোন ভাবনা নাই।

টিয়া সেখানে আসিল

দুর্গা ॥ এ তো আমার ভাগ্য। এস মা এস।

মহাজন ॥ এমন মা না হ'লে লক্ষ্মণ আজ লক্ষ্মণ ! কিন্তু আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। আমাদের এক্ষুনি রওনা হ'তে হবে—নইলে ট্রেন ধরতে পারব না। দুর্গা শ্রীহরি—দুর্গা শ্রীহরি।

*　　*　　*　　*

দৃশ্যান্তরে টিয়াকে লক্ষ্মণ বলিতেছে—

লক্ষ্মণ ॥ ঘরে একটা ময়ূর উড়ে' এসেছে দেখছি! শেকল দিয়ে বেঁধে রাখব?

টিয়া ॥ ধরা দিতেই যে এসেছে, তাকে বেঁধে লাভ?

লক্ষ্মণ ॥ ধরা তো দিচ্ছ শুধু দিন-কয়েকের জন্যে—মা'র কাছে সব শুনেছি। কিন্তু বাঁধতে চাই চিরজীবনের জন্যে।

টিয়া ॥ কথাটা শুনে মনে হচ্ছে—হ্যাঁ এরই নাম সত্যিকার যুদ্ধ।

* * * *

পরদিন ভোরে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখা গেল। একদল লালপাগড়িধারী পুলিসের সিপাহী সহ দারোগার আবির্ভাব হইল লক্ষ্মণের বাড়ীর সম্মুখে। ইহা ছাড়া আরও একটি লোককে দেখা যাইতেছে—সে আর কেহ নয়—মহাজন যুধিষ্ঠির সামন্ত স্বয়ং।

দারোগা ॥ বাড়ী ঘিরে ফ্যালো। দু'জন আমার সঙ্গে ভেতরে এস।

দারোগা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দুর্গা দরজা খুলিয়া বাহির হইল। লক্ষ্মণও বাহিরে আসিল।

দুর্গা ॥ এ কি! ব্যাপার কি?

দারোগা ॥ তল্লাসী পরোয়ানা—আমি বাড়ীঘর তল্লাসী করব।

টিয়া সেখানে আসিল

মহাজন ॥ টিয়া!

দারোগা ॥ ও কে?

মহাজন ॥ ওই আমার মেয়ে, হুজুর।

দারোগা ॥ (মহাজনকে দেখাইয়া) ইনিই তোমার বাবা?

টিয়া ॥ হ্যাঁ।

দারোগা ॥ তোমাকে এই লক্ষ্মণ মণ্ডল জোর ক'রে ধ'রে এনেছে? বেঁধে রেখেছে?

টিয়া প্রথমে তাহার বাবার মুখের দিকে তাকাইয়া পরে লক্ষ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল

টিয়া ॥ হ্যাঁ, রেখেছে তো।

দারোগা ॥ (লক্ষ্মণের প্রতি) আপনাকে গ্রেফতার করা হল। (একজন কনেস্টবলকে।) এই 'হ্যাণ্ড্ কাফ্'।

দুর্গা ॥ সে কি? মহাজন যে নিজে ঐ মেয়েকে কাল আমার কাছে রেখে গেছেন। (মহাজনের প্রতি) রেখে যাননি আপনি?

মহাজন ॥ সম্পত্তি নিয়ে যখন লক্ষ্মণের সঙ্গে আমার হাঙ্গামা চলছে, তখন আমি আমার মেয়েকে এখানে রেখে যাব! এরা দেখছি দিনকে রাত করতে পারে স্যর।

দুর্গা। ভগবান এত বড় মিথ্যে কখনও সইবেন না, মহাজন।

লক্ষ্মণ ॥ তুমি থামো মা। (দারোগার প্রতি) 'চার্জ'টা কি?

দারোগা ॥ 'কিড্ন্যাপিং চার্জ'। মহাজনের নাবালিকা কন্যা টিয়া দাসীকে তুমি জোর ক'রে ধ'রে বাড়ীতে আটকে রেখেছ।

টিয়া। তা, কালও তো বলেছে—বেঁধে রাখব চিরদিনের জন্যে। তুমি বললে না লক্ষ্মণদা?

মহাজন ॥ মানে? কি বলছিস তুই?

টিয়া ॥ বাবার ধারণা যে, আমি আজও তাঁর খুকিটি রয়েছি।

মহাজন ॥ তা নোস তো কি? এই তো সবে তেরো পেরিয়েছিস তুই।

টিয়া ॥ কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ বাবা—দু'দিন আগেও তুমি আমার কোষ্ঠী

দেখে বলেছ—'এই আঠারোতে পড়লি না, আর তোকে ঘরে রাখা যায় না'।

কোষ্ঠী লইয়া মহাজনের পুত্রবধূ হাস্যমুখী মালা সেখানে আসিল

মালা ॥ (টিয়াকে) এই যে ভাই, সেই কুষ্ঠীটা—

মহাজন ॥ বৌমা! তুমি!

মালা ॥ হ্যাঁ বাবা, কাজে লাগতে পারে ব'লে নিয়ে এলাম কুষ্ঠীটা। (টিয়ার প্রতি কৌতুকদৃষ্টিতে) যেখানে-সেখানে ফেলে রাখিস যে? ট্রাঙ্কে রাখতে পারিস না?

দারোগা ॥ দেখি কোষ্ঠীটা।

মালা ॥ (দারোগার হাতে দিয়া) তা, ওর বয়স আঠারোই হয়েছে।

মহাজন ॥ (ক্রোধে ফাটিয়া পড়িয়া) বৌমা! তুমি এখানে কেন?

দারোগা ॥ (কোষ্ঠী দেখিয়া হাসিয়া) আর কেন? বিয়েটা এইখানেই দিয়ে দিন মহাজন। মানে, ধ'রে রাখাতে যে মেয়ে কাঁদেনি, ছাড়িয়ে নিয়ে গেলে সে যে কান্নাকাটি করবে—এ-কথা মনে না করার কোন কারণ নেই। (টিয়াকে) কি বল মা? বাড়ী যাবে?

মহাজন ॥ বাড়ী যাবে না মানে?

টিয়া ॥ আর কি ক'রে যাব বাবা! তুমি ব'লে দিয়েছিলে—'জিজ্ঞেস করলে বলবি, তোকে বেঁধে এনেছে—বেঁধে রেখেছে'। সেই মিথ্যেটাই এখন এমন সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সে-বাঁধন আর কেউ খুলতে পারবে না—তুমিও পারবে না, আমিও না।

দারোগা ॥ (লক্ষ্মণের প্রতি) 'কংগ্রেচুলেশন্‌স্‌!'

(কনেস্টবলের প্রতি) এই, খুলে দাও।

(মহাজনের প্রতি) থানায়-আদালতে ছুটোছুটি না ক'রে পুরুত-

ঠাকুরের বাড়ী চ'লে যান সোজা। আর কেলেঙ্কারি বাড়াবেন না। (কনেস্টবলদের প্রতি) চল হে।

মহাজন॥ যত কেলেঙ্কারি হোক—মেয়ে জাহান্নমে যেতে হয় যাক্—এ বিয়ে আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না। কলকাতায় গিয়ে আমি বড় ব্যারিস্টার ধরছি, তারপর সবাই বুঝবে—কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল মহাজন। তৎপশ্চাৎ সদলে দারোগা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

*　　*　　*　　*

রাত প্রায় দশটা। কলিকাতায় উকিল-ব্যারিস্টারের পরামর্শ লইবার জন্য মহাজন শিয়ালদহ প্ল্যাটফরমে নামিলে তাহাকে কুলি ও রিক্সাওয়ালাতে ছাঁকিয়া ধরিল। যাহা হউক, সে একখানা রিক্সা ঠিক করিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল।

মহাজন॥ এই রিক্সাওয়ালা, চলো—চালাও নয়া রাস্তা ১২ নম্বর রতন চাটার্জ্জীর লেন।

ছোট-বড় অনেক পথ ঘুরিয়া অবশেষে রিক্সা একটা নির্জ্জন সরু গলির মধ্যে আসিল।

মহাজন॥ এই রোখো—রোখো—বাঁয়ে রোখো।

রিক্সা থামিল, মহাজন রিক্সা হইতে নামিল

মহাজন॥ কেত্‌না ভাড়া দেগা?

রিক্সাওয়ালা। এক রুপইয়া, বাবু।

মহাজন॥ রুপইয়া! চাইলেই হ'ল? টাকা অত সস্তা নয়। এই নে।

ঐ রিক্সাওয়ালাই যে অর্জ্জুন আজ কিন্তু কাহারও তাহা বুঝিবার উপায় নাই—চেহারার এমনই পরিবর্ত্তন

হইয়াছে। মহাজন যাহা দিল তাহা হাতে লইয়া দেখিয়া অর্জ্জুন কহিল—

অর্জ্জুন ॥ এ কি! মাত্র চার আনা!

মহাজন ॥ ওই যথেষ্ট।

অর্জ্জুন কটমট করিয়া মহাজনের দিকে তাকাইল। হঠাৎ সে মহাজনকে চিনিতে পারিল

অর্জ্জুন ॥ তাই বটে! ষোল আনা খাটিয়ে তুমি চিরকাল চার আনাই দিয়েছ!

মহাজন ॥ কি বলছিস?

অর্জ্জুন ॥ শুধু কি তাই? অনেককে তুমি একেবারেই ফাঁকি দিয়েছ!

মহাজন ॥ (উত্তেজিত হইয়া) তার মানে?

অর্জ্জুন ॥ (ভয়ঙ্কর ভঙ্গীতে) আমায় চিনতে পারছ মহাজন?

মহাজন ॥ (চিনিবার চেষ্টা করিয়া) কে? কে?

অর্জ্জুন ॥ চিনতে পারবে—চেষ্টা কর মহাজন। তুমি আমার বাবাকে পাগল ক'রে দিয়েছ—আমার স্ত্রী-পুত্রকে ভিটেছাড়া ক'রে খড়-কুটোর মত সহরের দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছ।

চরম উত্তেজিত হইয়া উঠিল

মহাজন ॥ (চিনিতে পারিয়া) অ—অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন ॥ (লাফাইয়া পড়িয়া) হ্যাঁ, তোমার যম!

মহাজনের গলা টিপিয়া ধরিল

মহাজন ॥ আমায় মারিসনে অর্জ্জুন—তোর পায়ে পড়ি—আমায় ছেড়ে দে।

অর্জ্জুন ॥ ছেড়ে দেবো! (চাপা উৎকট হাসি) জীবনের হিসেব আমার গরমিল ক'রে দিলে তুমি—তোমায় আমি ছেড়ে দেব?

গলা আরও জোরে টিপিয়া ধরিল

মহাজন ॥ (যন্ত্রণায় গোঙাইতে লাগিল) ছেড়ে দে অর্জ্জুন—তোর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের—আমার মেয়ের—

মহাজন নিস্পন্দ হইয়া গেলে অর্জ্জুন থামিল

অর্জ্জুন ॥ এ কি! মহাজন! মহাজন!…ম'রে গেছে? আমি খুন করেছি!…আমি খুন করলাম!…এ আমি কি করলাম?—এ আমি কি করলাম?

*   *   *   *

অর্জ্জুন প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল—কিন্তু কোথায় তাহা সে জানে না। সে ছোটে আর পিছন ফিরিয়া সভয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে—কেহ তাহার পিছু নিয়াছে কিনা। সে খুনী—মহাজনকে সে উত্তেজনার বশে, প্রতিহিংসার বশে গলা টিপিয়া মারিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল—সকলেই যেন তাহার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইতেছে। যে-দিকে ছোটে সেই দিকেই মনে হইতে লাগিল যেন সীমাহীন জলরাশি তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে হাঁপাইয়া উঠিল—আর ছুটিতে পারে না। হঠাৎ সে এক পথচারীর গায়ে ধাক্কা খাইল। লোকটি গালি দিয়া উঠিল—

লোকটি ॥ কানা নাকি ব্যাটা!

সে অর্জ্জুনের ঘাড় ধরিল, কিন্তু অর্জ্জুনের মুখের অবস্থা দেখিয়া যখন সে বুঝিল যে, রিক্সাওয়ালা বেচারি অনুতপ্ত ও অতিরিক্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন আর বিশেষ কিছু না করিয়া শুধু বলিল—

যা ব্যাটা, সাবধানে পথ চলবি।

লোকটি নিজের পথে চলিয়া গেল

অর্জ্জুন চায় একটা নির্জ্জন জায়গা। তাহার কানে বাজিতে লাগিল মুমূর্ষু মহাজনের সেই কাতর কণ্ঠ "আমায় মারিসনে অর্জ্জুন—তোর পায়ে পড়ি আমায় ছেড়ে দে—তোর ছেলের সঙ্গে আমার—"

একটা বাড়ীর দেয়ালে ঠেস দিয়া সে হাঁফাইতে লাগিল। খানিক পরে আবার চলিতে সুরু করিল। এইভাবে সে ঘুরিতে লাগিল লক্ষ্যহীন অবস্থায়—কলিকাতার রাস্তায়। সহসা এক সময় তাহার মনে জাগিল—সে তাহার গ্রামে যাইবে, কলিকাতার বাতাস তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, গ্রামে গেলেই হয়তো সে বাঁচিবে—নির্জ্জনতা, মুক্ত হাওয়া, সবকিছুই সেখানে আছে।

অর্জ্জুন শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। গাড়ীর মধ্যে বসিয়া কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল একটানা গাড়ীচলার শব্দ। উহাই রূপান্তরিত হইয়া যেন তাহার কানে বাজিতে লাগিল "আমায় মারিসনে অর্জ্জুন—তোর পায়ে পড়ি—আমায় ছেড়ে দে—"

* * * *

"কল্যাণপুর সমবায় সমিতি—ধান্যবিক্রয়-বিভাগ।"

গাড়ীবোঝাই ধান সমিতির ভাণ্ডারে জমা হইতেছে। লক্ষ্মণের বাড়ী হইতে সানাইয়ের সুর ভাসিয়া আসিতেছে।

* * * *

আলোকমালায় সজ্জিত লক্ষ্মণের বাড়ী। সমবায়-সমিতির ঘরগুলিও দীপসাজে সজ্জিত। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া অর্জ্জুন দেখিতেছে।

নহবত বাজিতেছে

* * * *

দুর্গার ঘর। উন্মুক্ত বাতায়ন। নহবতের বাজনা শুনা যাইতেছে। বধূবেশে সজ্জিতা টিয়া ও বরবেশে সজ্জিত লক্ষ্মণকে লইয়া দুর্গা ঘরে আসিল। বর ও বধূ উভয়ে অর্জ্জুনের খড়ম প্রণাম করিয়া উঠিল। দুর্গা গললগ্নীকৃতবাসে খড়মের সামনে বসিয়া স্বামীর উদ্দেশে কহিল—

দুর্গা ॥ এমন দিনে তুমি আমাদের কাছে নাই! যেখানেই থাক, তুমি এদের আশীর্ব্বাদ করো। যে-দুঃখ পেয়ে তুমি গেছ, সে-দুঃখ যেন এদের জীবনে কখনও না আসে।

অর্জ্জুন বাহিরে দাঁড়াইয়া বাতায়নপথে সবই দেখিল—সবই শুনিতে লাগিল। তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

* * * *

গভীর রাত্রি। সুষুপ্ত ধরণী। ফুলশয্যা। বরবধূ ঘুমাইতেছে।

* * * *

দুর্গার শয়নকক্ষ। দুর্গা তাহার বিছানায় শুইয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছে। এই আনন্দের দিনেও তাহার চোখে ঘুম নাই। গভীর বেদনায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছে। ঘরের মাটির প্রদীপটি নিভিয়া আসিতেছে। শয্যাপার্শ্বস্থ উন্মুক্ত বাতায়নের বাহিরে নিশাচর প্রেতের ন্যায় অর্জ্জুন আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, খড়ম হাতে লইয়া দুর্গা কাঁদিতেছে।

অর্জ্জুন ॥ দুর্গা!

দুর্গা। কে!

অর্জ্জুন ॥ চুপ, আমি।

দুর্গা ॥ তুমি—তু—

অর্জ্জুন ॥ (চাপা গলায়) চুপ। আস্তে।

দুর্গা ॥ (চাপা গলায়) তুমি !

অর্জ্জুন ॥ (চাপা গলায়) হ্যাঁ। একবার বাইরে এস দুর্গা—বাইরে এস—

দুর্গা ॥ যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি—

* * * *

বাতায়নের বাহিরে দুর্গা ও অর্জ্জুন

দুর্গা ॥ তুমি—কিন্তু এখানে এমনভাবে দাঁড়িয়ে কেন? ঘরে এস —আজ তোমার ঘরে চাঁদের হাট।

অর্জ্জুন ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি দেখেছি—আমি সব দেখেছি। দেখেছি চোরের মত লুকিয়ে।

দুর্গা ॥ কেন—লুকিয়ে কেন? ঘরে এস। আমি ওদের ডেকে তুলছি। তুমি ওদের আশীর্ব্বাদ করো।

অর্জ্জুন ॥ অ্যাঁ, আশীর্ব্বাদ! জানি না আমার আশীর্ব্বাদের কোন দাম আছে কিনা; তবু আশীর্ব্বাদ করেছি—জীবনে এই শেষ বার ভগবানের কাছে কেঁদে বলেছি, ওরা যেন আমার মত কোনদিন গরিব না হয়। গরিব ব'লেই তোমার মত স্ত্রী, লক্ষ্মণের মত ছেলে থাকতেও তোমাদের নিয়ে আমি ঘর করতে পারিনি।

দুর্গা ॥ কিন্তু আজ ও-কথা কেন? আজ তোমার ছেলে সত্যি বড় হয়েছে। আজ তার বিয়ের রাত।

অর্জ্জুন ॥ সেইজন্যেই তো আজ সব কথা এক সঙ্গে মনে পড়ছে দুর্গা। চাষীর ছেলে—বাবার দেনা ঘাড়ে নিয়ে জন্মেছিলাম। চেয়েছিলাম পৃথিবীর কাছে—দু'বেলা দু'মুঠো ভাত আর পরনে থানদুই কাপড়,

মাথার ওপর একটু খানি চালা থাকবে, থাকবে একটি হাল আর দুটি বলদ, আর থাকবে বিঘে দুই মাটি, সেখানে ফলবে আমাদের পেটের অন্ন। আরো একটু দাবী ছিল দুর্গা। তারই সঙ্গে চেয়েছিলাম বাপের স্নেহ, স্ত্রীর ভালবাসা, ছেলের সেবা—

আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—পুনরায় স্বাভাবিক স্বরে কহিতে লাগিল।

বছরের পর বছর রোদে পুড়েছি, জলে ভিজেছি—জমিদার-মহাজনের পাওনা মেটাতে; তবু—তবু আজ আমার ছেলে আর ছেলের বৌকে আশীর্ব্বাদ করার আমার অধিকার নেই।

দুর্গা ॥ কেন?

অর্জ্জুন ॥ পুলিস—পুলিস আমার পিছু নিয়েছে।

দুর্গা ॥ পুলিস! কেন, কি করেছ তুমি?

অর্জ্জুন ॥ মহাজন—

দুর্গা ॥ মহাজন কী?

অর্জ্জুন ॥ আমি তাকে খুন করেছি।

দুর্গা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

গরিব হওয়ার পাপে আমার এই সংসার ভেঙে চুরে খান খান হয়ে গিয়েছিল। দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু জল ক'রে সেই ভাঙা সংসারকে তুমি সোনার সংসার ক'রে তুলেছ। আমি পালাই দুর্গা। এখানে ধরা পড়লে তোমার সাজানো সংসার আবার ভেঙে যাবে। বাপ হয়ে আমি ভেঙেছি—মা হয়ে তুমি গড়েছ। কিন্তু এবার ভাঙলে তুমিও আর গড়তে পারবে না দুর্গা।

নতমুখে দুর্গা শুনিতেছিল, এবার স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল—

দুর্গা ॥ দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

অর্জ্জুন ॥ তুমি!

দুর্গা ॥ হ্যাঁ। আজ লক্ষ্মণ সব পেয়েছে, কিন্তু তুমি তো কিছুই পেলে না জীবনে! আমি কি শুধুই লক্ষ্মণের মা? আমি তোমার স্ত্রী—অনেক দুঃখের পর ফিরে পেয়েছি তোমাকে। আর তোমায় হারাতে পারব না—তোমার সুখ-দুঃখই আমার সুখ-দুঃখ।

অর্জ্জুন। কিন্তু দুর্গা, পাপ—আমি পাপ করেছি—জীবনে কিছুই তোমায় দেইনি, আজ শুধু আমার পাপের ভাগই কি তোমাকে দেবো? না দুর্গা, আমি পারব না। আমি যাই—

নেপথ্যে লক্ষ্মণের কণ্ঠ শোনা গেল—"মা-মা!" সেই স্বর শুনিয়া অর্জ্জুন বিচলিত হইয়া কহিল—

আমার ছেলে…! তোমায় ডাকছে—তোমায় ডাকছে। তুমি যাও—তুমি যাও।

অর্জ্জুন চলিতে লাগিল

দুর্গা ॥ একটু দাঁড়াও।

অর্জ্জুন থামিল। দুর্গা গললগ্নীকৃতবাস হইয়া অর্জ্জুনকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অর্জ্জুন দুর্গার মুখের পানে তাকাইয়া অস্ফুট স্বরে দুর্গাকে ডাকিল; কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংবরণ করিয়া কহিল—

অর্জ্জুন ॥ না, বলব না। তোমার এই পরশটুকুই আমার জীবনে শেষ পরশ।

অর্জ্জুন ঘুরিয়া দাঁড়াইল। সে চলিয়া যাইতে লাগিল দুর্গার দৃষ্টির বাহিরে—জীবনের বাহিরে। দুর্গা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—অর্জ্জুনের প্রিয়া নয়—অর্জ্জুনের স্ত্রী নয়—অর্জ্জুনের সন্তানের জননী—যে সন্তানকে গড়িয়া তোলে—স্বামীর সংসার গড়িয়া দেয়।

* * * *

নিশাচর প্রেতের মত অর্জ্জুন সেই নিশীথ রাত্রে গ্রামের নির্জ্জন পথে অগ্রসর হইতেছে। দেখিয়া মনে হইতেছে তাহার ক্লান্ত অবসন্ন দেহ আর চলিতে চাহিতেছে না। সে কখনও বসিয়া পড়িতেছে—আবার বিপুল প্রয়াসে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলা সুরু করিতেছে। এমনি করিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে আর চলিতে পারে না অর্জ্জুন। কিন্তু আজ সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যেমন করিয়াই হোক্ সে তাহার গন্তব্যস্থলে যাইবেই। সে হামাগুড়ি দিয়া পৌঁছিল তাহার গন্তব্যস্থলে—মহাজনের বাড়ীর ফটকের সম্মুখে। সেখানে সে মাটিতে মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

অর্জ্জুন ॥ মহাজন, মহাজন, আমায় তুমি ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মহাজন!

এই সময় পথ হইতে ফটকের সামনে একটি গরুর গাড়ী আসিয়া থামিল এবং গাড়ী হইতে একজন লোক নামিয়া গাড়োয়ানের সহায্যে আর-একটি লোককে ধরিয়া নামাইল—সে মহাজন। তাহার দেহে তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মহাজন ফটকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, একটি লোক সেখানে পড়িয়া ধুঁকিতেছে।

মহাজন ॥ কে? কে ওখানে?

অর্জ্জুন সেই স্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহাজনের মুখের দিকে তাকাইয়া দেহ ও মনের সমস্ত শক্তিতে চিৎকার করিয়া উঠিল—

অর্জ্জুন ॥ কে তুমি? কে! তুমি! বেঁচে আছ! আমায় ক্ষমা কর মহাজন!

মহাজন ॥ মহাজন নয়, বল বেয়াই। বেঁচে যখন আছি, তখন এই সম্বন্ধটাই পাকা হোক। বেয়াই, না বাঁচলে তো তোমাকে বেয়াই ব'লে ডাকতে পারতাম না।

অর্জ্জুন ॥ বেয়াই! বেয়াই!

উভয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ হইল। লক্ষ্মণের বাড়ী হইতে তখনও সানাইএর সুর ভাসিয়া আসিতেছে।



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স‌এর পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নবযুগের নাট্যসাহিত্য

নাট্যকার মন্মথ রায়ের

নাট্যগ্রন্থাবলী

কারাগার—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটারে এবং পরে নাট্যনিকেতনে অভিনীত হইয়া "জাতির মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে। 'বার্নার্ড শ'র 'সেণ্ট জোয়ান'এর সহিত একাসনে স্থান পাইয়াছে।"—বিজলী।···পরাধীন ভারতে এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল। নয় সিকা

মুক্তির ডাক—একাঙ্ক নাটক। স্টার থিয়েটার। "মেটারলিঙ্কের 'মনাভনা'র সহিত তুলনা হইতে পারে।"—প্রবর্ত্তক। ছয় আনা

দেবাসুর—পঞ্চাঙ্ক বৈদিক নাটক। স্টার থিয়েটার। জাতির মুক্তিযজ্ঞে দধীচির আত্মাহুতি। "ফ্রোরা এনাইন স্টীলএর কৃতিত্বের সহিত লেখকের কৃতিত্ব একাসনে স্থান পাইয়াছে।"—ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এক টাকা

চাঁদ সদাগর—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন ও স্টার থিয়েটার। শত শত রাত্রি অভিনীত হইয়াও পুরাতন হয় নাই। "কি ভাষার দিক দিয়া, কি চরিত্রাঙ্কনে প্রকৃত শিল্পীর রসবোধের পরিচয় তিনি দিয়াছেন। বাঙলার প্রাণের বেদনা-করুণা-অশ্রুমাখা অতীত স্মৃতি এই চাঁদ সদাগর দর্শককে অভিভূত করিবে সন্দেহ নাই।"—আনন্দবাজার পত্রিকা। এক টাকা

শ্রীবৎস—পঞ্চাঙ্ক নাটক। স্টার থিয়েটার। "এমনি নাটকের অভিনয়েই রঙ্গমঞ্চের লোকশিক্ষক নাম সার্থক।"—'নবশক্তি'তে 'চন্দ্রশেখর'। এক টাকা

মহুয়া—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটার। "ও-দেশের জগৎ-প্রসিদ্ধ 'কারমেন'এর সহিত তুলনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না।"—'নবশক্তি'তে 'চন্দ্রশেখর'। এক টাকা

সাবিত্রী—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। "সাবিত্রীর পুরাতন পরিচিত কাহিনীর মর্ম্মগত সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাট্যকার উহাকে এমন এক চিত্তহারী মধুর রূপ দিয়াছেন যাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য প্রত্যেক দৃশ্যে কৌতূহল ও কারুণ্যের মধ্য দিয়া অনাড়ম্বরে স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া এক আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত তৃপ্তিময় পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহা পুরাতনকে নূতন করিয়াছে, আধুনিককে সনাতন সত্যের অচলপ্রতিষ্ঠ বেদী দেখাইয়াছে।"—আনন্দবাজার পত্রিকা। পাঁচ সিকা

অশোক—পঞ্চাঙ্ক নাটক। রঙমহল। "নাট্যকারের মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। অশোকের জীবনে যে দু'টি পরস্পরবিরোধী শক্তির সঙ্ঘর্ষ চলেছে এবং পশুশক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে পরিশেষে যেভাবে অশোকের মগ্নচৈতন্যের আত্মবিকাশ ঘটেছে, তা সম্পূর্ণভাবে উচ্চাঙ্গের 'ড্রামা'র বিষয়বস্তু। নাট্যকার যেভাবে কুণালের প্রতি তিষ্যরক্ষিতার প্রেমের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন তা একমাত্র প্রথম শ্রেণীর 'আর্টিস্ট'এর তুলির কাজের সঙ্গে তুলনীয়। নাট্যকারের ভাষানৈপুণ্যে এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে নাটকের গল্পটি দর্শকসাধারণেরও চিত্তাকর্ষক হবে।"—'দীপালী'তে 'চন্দ্রশেখর'

'An epic grandeur.'—Amritabazar Patrika. দুই টাকা

খনা—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। "নাট্য-কৃতিত্বের চরম উৎকর্ষতা।"—আনন্দবাজার পত্রিকা

"বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এই নাটক যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।"—দেশ

"Khana, from the pen of Manmatha Ray, is perhaps God's answer to the theatre-owners' prayer for a play that will please all classes of audiences without calling forth the best in the artists. And that is where the dramatist triumphs over the players as a whole.···An excellent example of this noted author's rare knack of turning legends of yore into engrossing plays to the liking of modern audiences.···Ray wields a powerful pen and is a past-master in giving such twists to a story that go a long way in creating dramatic situations and climaxes. In Khana both these qualities have admirably combined to effect popular entertainment with a capital P and E.···A strong story-interest that never lets the attention of the audience flag till the very final curtain.—'Thespis' in 'Dipali' পাঁচ সিকা

সতী—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। দক্ষযজ্ঞের পুরাতন কাহিনীর অভিনব অপরূপ রূপ। "হাসি এবং অশ্রু সমুজ্জ্বল।"—আনন্দবাজার পত্রিকা। পাঁচ সিকা

বিদ্যুৎপর্ণা—চারিটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ একাঙ্কিকা। C. A. P., ফার্স্ট এম্পায়ার। সাধনা বোস ও অহীন্দ্র চৌধুরীর নাটনৈপুণ্যের কীর্ত্তি-স্তম্ভ। গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। "নাটকীয় ঘটনা-সংস্থাপনায়, সংলাপ ও কল্পনার মনোহারিত্বে অভিনব।"—যুগান্তর।

"The author is to be congratulated without reserve."—Amritabazar Patrika. বারো আনা

রাজনর্তকী—এই নাটিকাখানি 'রাজনর্তকী' নামে বাঙলা ও হিন্দীতে এবং 'Court Dancer' নামে ভারতে প্রস্তুত প্রথম ইংরেজী সবাক্ চিত্র রূপে চিত্রজগতে বিখ্যাত হইয়াছে।

"এই নাটকের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রতিভার যশোগান করিতেছি।"—আনন্দবাজার পত্রিকা। বারো আনা

রূপকথা—চারিটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নৃত্যগীতবহুল নাটিকা। "এরূপ একখানি অভিনব ও সুলিখিত নাটকের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়কে অভিনন্দিত করিতেছি।"—আনন্দবাজার পত্রিকা।

"Monmotho Roy, the noted play wright of the modern Bengali school has given it an exquisite dramatic shape mostly on the lives of the European pantomime."—N K G in Amritabazar Patrika.

"Monmotho Roy has struck a new note in stage literature"—'Dipali'.

মীর কাশিম—পঞ্চাঙ্ক নাটক। "বর্ত্তমান যুগে এই নাটকখানি বিশেষ আদর পাইবে আশা করি।" ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার।

"আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, নাটকখানি দেশপ্রাণ বাঙালী নরনারীর চিত্তজয় করিতে সমর্থ হইবে।"—দেশ,

"প্রত্যেকটি বাঙালীর এই 'মীর কাশিম' দেখা অবশ্যকর্ত্তব্য। 'মীর কাশিম' নাটকে মৃতসঞ্জীবনীর মন্ত্র রহিয়াছে।"—যুগান্তর

"ঐতিহাসিক সত্য অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় অনবদ্য নাটক-সৃষ্টি করিয়াছেন।"—আনন্দবাজার পত্রিকা। দুই টাকা

একাঙ্কিকা—বাঙলাসাহিত্যে একাঙ্ক নাটকের প্রবর্ত্তক মন্মথ রায়ের সুপ্রসিদ্ধ আটটি একাঙ্ক নাটকের সংগ্রহ।

"Sri Monmotho Roy is ihe dramatist of the day. His dramas, whether social, mythological, or historical, are different from others of the kind, and have brought a change in the old order. Ekankika has created a new atmosphere in the circle of histrionic art as well as literary circle. Each of the playlets, though short, is complete in itself in one act, beautiful and thought-provoking."—Amritabazar Patrika.

পাঁচসিকা